সোঁদামাটি

শারদ সংখ্যা ১৪২৬

সোঁদামাটি

শারদ সংখ্যা ১৪২৬

ষষ্ঠ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

আশ্বিন ১৪২৬ : সেপ্টেম্বর ২০১৯

সম্পাদক

দীননাথ মণ্ডল

প্রচ্ছদ : নয়ন সিংহ

পত্রিকা দপ্তর
মির্জাপুর, বেলডাঙা,
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৩

ওয়েবসাইট : www.sondamati.blogspot.in
ফেসবুক : www.f.b.com/sondamati
মেইল : sondamati@gmail.com
মোবাইল : +৯১ ৯১৫৩১২৬৬১৩

বিনিময় মূল্য : ৩০ টাকা

সোঁদামাটি-র বর্ষা সংখ্যা ১৪২৩, প্রকাশ অনুষ্ঠান ৭ আগস্ট ২০১৬

বেলডাঙ্গা দারুল হাদীস সিনিয়ার মাদ্রাসার কনফারেন্স রুম

সম্পাদকীয়

নীল আকাশ। শুভ্র মেঘ। কাশ ফুল। শিউলি ফুলের মোহমোহ সুগন্ধ। সব কিছুর মধ্যে সজীবতার স্বতঃস্ফূর্ততা। অফুরন্ত আনন্দের কলতান। বাঙালির অন্দরে আনাগোনা শারদ উৎসব। উৎসবের প্রাণ তার নতুনত্বে। ঢাক, কাঁসরের ছন্দ-তালের সুর মিশে যাক বাঙালির হৃদয় থেকে হৃদয়ে। হিংসা-বিচ্ছেদ, ভেদাভেদ, হানাহানি, খুনোখুনি, অজ্ঞতার অন্ধকার - দেবীর আগমনী আলোয় মুছে যাক মানুষের মন থেকে। উৎসবের আনন্দই বয়ে চলুক দিন হতে দিনান্তর, যুগ হতে যুগান্তর।

দীননাথ মণ্ডল

সূচিপত্র

= গল্প = ৫—১৬

= প্রবন্ধ = ১৭—২২

= একাঙ্ক নাটক = ২৩—২৫

= রম্যরচনা = ২৬—২৭

= ছড়া = ৩০—৩২

= কবিতা = ৩৩—৩৯

অথ গার্লফ্রেন্ড কথা

সুকুমার রুজ

তুমি ভাবো যে, আমি কিছু বুঝি না! আমি সব জানি, সব বুঝি। কিছু বলি না। কারণ অশান্তি আমার ভালো লাগে না।

তুমি কি-ক্-কী জানো?

তোমার গার্লফ্রেন্ড, আউটিং স-ব স-ব। হয় তো বলবে, 'জানো তো জানো, আমার কিচ্ছু যায় আসে না।' আমি কিছু বলি না কারণ, তুমি ওতে ভালো থাকো। হাসিখুশি থাকো। শুনেছি, প্রেম করলে নাকি হার্ট ভালো থাকে। তুমি তো হার্টের পেশেন্ট।

ব্যস! তাহলে তো পারমিশন দিয়েই দিলে! এ নিয়ে আর বলার কী আছে!

একটা কথা বলার ছিল।

বলে ফ্যালো তাড়াতাড়ি। বেরোতে হবে, সময় নেই।

বলছিলাম, আমারও তো হার্টের রোগ ধরা পড়েছে। তাই ভাবছি, আমি একটা বয়ফ্রেন্ড করব।

করো, করে ফেলো! কে নিষেধ করেছে!

বলছ!

হ্যাঁ, বলছি তো। বয়ফ্রেন্ড কর। আউটিংয়ে যাও। কিন্তু সংসারকে বা আমাকে নেগলেক্ট করে নয়। আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে তুমি করতেই পারো। যত্তসব আদিখ্যেতা, বয়ফ্রেন্ড করবে!

শোনো না! তাহলে আমাকে একটা বয়ফ্রেন্ড জোগাড় করে দেবে?

তোমার বয়ফ্রেন্ড আমি কি করে জোগাড় করব! এসব কেউ কারুরটা জোগাড় করে দিতে পারে না। নিজের ক্যালিতে জোগাড় করতে হয়।

আমি তোমারই বন্ধু দু'একজনের কথা ভেবে রেখেছি।

ব্যস! তাহলে তো হয়ে গেল। ওদের মধ্যে থেকে একজনকে চুজ কর, প্রোপোজ কর।

বলছিলাম, গৌতমদা হলে কেমন হয়? বয়স একটু বেশি ঠিকই, কিন্তু এখনো বেশ হ্যানসাম। ব্যবহারটাও খুব পোলাইট। কী সুন্দর মজা করে কথা বলে।

প্রোপোজ করে দেখতে পারো। তবে ওর কাছে অন্যকিছু আশা ক'রো না। ব্যাটা ধ্বজভঙ্গ।

অন্য কিছুর দরকার নেই আমার। মোবাইলে কিছুক্ষণ ধরে চ্যাটিং করব, একটু আধটু ঘুরব, কিংবা আইনক্সে সিনেমা দেখব। ব্যস!

তুমি যেন মোবাইলে কারও সঙ্গে চ্যাটিং কর না, বা সিনেমা দেখতে যাও না!
তা যাই। তবে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে যাওয়ার মজাই আলাদা। তুমি যেমন গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে...। আচ্ছা, বলছিলাম, গৌতমদা না হয়ে চন্দনদা হলে কেমন হয়? ওর গাড়ি আছে। মালদারও বটে। গাড়িতে করে ঘোরাবে। দামি-দা্মি গিফট্ দিবে। তোমাকে যেমন তোমার গার্লফ্রেন্ডরা দেয়।

তাহলে চন্দনদা'কেই প্রোপোজ কর। নাহলে দেবু, অভিজিত, তমাল, সঞ্জয়... আমার বন্ধুর তো অভাব নেই। সবাইকেই তুমি চিনো। তবে একটাই কথা, আমার দরকারের সময় যেন তোমাকে পাই।

দেখি ভেবে, কী করা যায়।

দেখো, আর শোনো, ড্রেসিং টেবিলের সামনে বডি-স্প্রে-টা আছে দাও তো! আর ভালো কথা, আমার ফিরতে রাত হবে। জরুরি কাজ আছে। ফোন করে ডিসটার্ব করবে না।

এই নাও বডি-স্প্রে। এক মিনিট দাঁড়াও না!

বল তাড়াতাড়ি, সময় নেই।

বলছিলাম, আমি সকলের কথাই ভেবে দেখলাম। বয়ফ্রেন্ড হিসেবে কাউকে পছন্দ হচ্ছে না। তুমি আমার বয়ফ্রেন্ড হও না! তোমার তো অনেক গার্লফ্রেন্ড আছে। একটা না হয় বাড়ল। আমি কি তোমার গার্লফ্রেন্ড হিসেবে খুব খারাপ হব? দেখো, আমার ফিগার-টিগার এখনও ঠিকঠাকই আছে।

তুমি... মানে... আমি তোমার বয়ফ্রেন্ড! মানে হাসব্যান্ডই বয়ফ্রেন্ড...!

কী হল! অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন! তোমার চোখের কোনাটা চিকচিক করছে কেন গো? চোখে কুটো-টুটো পড়ল নাকি!

তোমারও তো দেখছি চোখ দুটো...!

প্রত্নপ্রেম

সুকুমার সরকার

কলেজের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ইতিহাসের প্রত্ন-নগরীতে এসে দাঁড়াল অয়ন আর সেবন্তিকা। সামান্যই খনন হয়েছে এ নগরীর। উঁচু ঢিবির ওপর ভগ্ন প্রাচীরের কয়েকটি ঘর বাড়ি আর চতুর্দিকে ছড়ানো ছিটানো ইটের টুকরো।

চতুর্দিকে পরিখা দিয়ে ঘেরা এই প্রত্ন-নগরীর মাঝখানের উঁচু ঢিবির এক কোণে একটি বিরল বৃক্ষ আছে। জনশ্রুতি, বৃক্ষটি বহু হাজার বছরের প্রাচীন। অয়ন আর সেবন্তিকা সেই বিরল বৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

মধ্য দুপুর। জনমানব খুব একটা নেই। তাদেরই মতো কয়েকজন যুবক যুবতী ইতিউতি ঘুরছে। কেউ কেউ ভগ্ন প্রাচীরের আড়ালে হাতে হাত, ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে প্রেম করছে।

সেবন্তিকা উঁচু ঢিবির উঁচু জায়গাটিতে উঠে দাঁড়াল। অয়ন সেবন্তিকার হাঁটুর নীচে এক হাঁটু গেড়ে নায়কোচিত ভঙ্গিতে বসে পড়ল।

সেবন্তিকা দুই হাত দুই দিকে বাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল। অয়ন হাঁটু গেড়েই সেবন্তিকার কোমর জড়িয়ে ধরল। অয়নের মুখ সেবন্তিকার নাভির নীচে।

ইতিহাসের প্রত্ন-নগরী সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলো না। একটু দূরে মাঝ বয়সী এক দম্পতি আগে পিছে হাঁটছিল। কী মনে করে এই মধ্য দুপুরে তারাও এসেছেন প্রত্ন-নগরী দেখতে। কিন্তু দেখার তো কিছু নেই এই মধ্য দুপুরে প্রত্ন-নগরীর ইট কাট পোড়ামাটির হাহাকার আর অল্প বয়সী যুবক যুবতীদের প্রেমলীলা ছাড়া! তারই মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাঝ বয়সী ভদ্রলোকের মনে প্রত্ন-নগরীর মতো প্রেমের উষ্ণ প্রস্রবন জেগে উঠল।

এক জায়গায় ভগ্ন প্রাচীরের আড়াল পেতেই স্ত্রী রমাকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরতে গেলেন।

রমা হ্যচকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এসব কী? ছেলে-মেয়েদের প্রেম দেখে বুড়ো বয়সে তোমারও প্রেম জাগল বুঝি! প্রত্ন-প্রেম এভাবে জাগাতে নেই! মাটি খুড়ে ইতিহাসের গভীরে ঢুকতে হয় বুঝলে!

স্বামী কী বুঝল রমা তার তোয়াক্কা না করে এক টুকরো ইট হাতে তুলে নিয়ে বলল, এই আমাদের ঐতিহ্য! ইতিহাস! এর গন্ধ শোকো, দেখবে সেখানেও প্রেম ছিল। কিন্তু এমন বেলাল্লাপনা ছিল না। ওই যেমন ছেলে মেয়েরা করছে।

ভদ্রলোক ইটের টুকরোটি হাতে নিয়ে শুকতে লাগলেন। কিন্তু কিছুই পেলেন না। আহত মনে ইটটিকে দূরে ফেলে দিলেন।

ঢিবির ওপর থেকে বুড়ো বুড়ির প্রেম খুনসুটি দেখছিল সেবন্তিকা। বুড়ো-বুড়ি লজ্জা দেখেও সেবন্তিকার লজ্জা হলো না। নিচু হয়ে অয়নের মাথা নিজের শরীরের সঙ্গে আরও জোরে চেপে ধরল।

আইটেম বোম

সিদ্ধার্থ সিংহ

হিন্দি সিনেমার আইটেম গার্ল। একেবারে ঝাক্কাস মেয়ে। ওয়ার্ল্ড ট্যুরে বেরোচ্ছেন। সুইজারল্যান্ডের সব চেয়ে বড় স্টেডিয়ামে তাঁর শো। লাইভ টেলিকাস্ট হবে চ্যানেল টু চ্যানেল। সারা পৃথিবী জুড়ে। তবু টিকিটের জন্য দাঙ্গা বেঁধে গেছে। বিভিন্ন এয়ারলাইন্স ওই দিনের জন্য স্পেশাল ফ্লাইট দিচ্ছে। লোকে বলে, ডাক্তাররা নাকি এখন আর কাউকে ভায়াগ্রা প্রেসক্রাইব করেন না। বলেন, ওঁর নাচ দেখুন, তা হলেই হবে।

সব ঠিক আছে। কিন্তু সমস্যা হল, ওই শোয়ে কী পরবেন তিনি! এমন পোশাক চাই, যাতে তাঁর সমস্ত রেকর্ড ব্রেক করে যায়। উনি কল করলেন পৃথিবীখ্যাত এক ডিজাইনারকে। একটা ছোট্ট লেডিজ রুমাল দিয়ে বললেন, আমাকে এটা ড্রেস বানিয়ে দিন।

ডিজাইনার গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ভাবছেন আর ভাবছেন। মনে মনে কত কিছু কাট-ছাঁট করছেন। তাঁকে অত চিন্তাভাবনা করতে দেখে আইটেম গার্ল বললেন, কী হল? এতে হবে না?

ডিজাইনার বললেন, না না, হবে না কেন? হবে হবে। আমি ভাবছি, যে কাপড়টা বাঁচবে, সেটা দিয়ে কী বানাব!

কথা

নরেশ মণ্ডল

অনেকক্ষণ হল সকাল হয়েছে। আলতো রোদ ছুঁয়ে থাকে টেবিলটা। কাগজ হাতে সুদীপ্ত।

- তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে। বলে এগিয়ে আসে রূপা।

- বলো, কী তোমার জরুরি কথা। যার জন্য হঠাৎ এত উদগ্রীব ভাব। সচরাচর এমনটা বড়ো একটা দেখি না। বলো, কী বলবে। হাসিমুখে বলে সুদীপ্ত।

- না, মানে একটা কথা তোমায় বলব বলে অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম। কিন্তু বলা হয়ে ওঠেনি। বলাটা খুব জরুরি।

আরে কী বলবে বলো না। এত কিন্তু কিন্তু করার কী আছে ! আমি তো বাইরের কেউ নই। ধোঁয়া ওঠা সদ্য গরম। চায়ে চুমুক দিয়ে কথাগুলো বলে সুদীপ্ত।

সদ্যস্নাত। আলুলায়িত চুল কোমর ছোঁয়। একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগে সুদীপ্তর। বুক ভরে টেনে নেয় একবার। রুশা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। লাইটপোস্টের ভারে দুটো কাক পরস্পরের ঠোঁট ছোঁয়। একটু দূরে একটা কাক আপন মনে পিঠের পালকে

ঠোঁট ঢুকিয়ে বসে থাকে।

সুদীপ্ত অস্থির হয়ে বলে - কী হলো, চুপ করে আছো? এই তো বললে অনেকদিন ধরে একটা কথা বলবে বলে ভাবছিলে। তোমার মধ্যে অন্যরকম ভাবও তখন লক্ষ্য করছিলাম। হঠাৎ এত চুপ মেরে গেলে যে। প্লিজ বলো না। কী বলবে! সুদীপ্তর মধ্যে এক আকুলতা।

রূপা দূরে, অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। এক সময় অস্পষ্ট স্বরে বলে... না, থাক।

রূপা, প্লিজ বলো না। কী বলবে বলো না, বলে চিৎকার করে ওঠে সুদীপ্ত।

নোটিফিকেশন

সাজ্জাদ আলম

সকালে ঘুম থেকে উঠেই ব্রাশ করার আগে ফেসবুক করাটা মিলির ছোটবেলার অভ্যাস। ছোটবেলা বলতে মিলি যখন প্রথম হাতে মোবাইল পেয়েছিল, উচ্চমাধ্যমিকের পর, সে হবে বছর ছয়-সাত আগের কথা। কাল রাতেই একটা নোটিফিকেশন এসেছে ফেসবুকে কিন্তু মিলির তা এখনও দেখা হয়ে ওঠেনি। সকালে উঠে যেই না ফেসবুকটা একটু খুলবে, ঠিক সেই সময়েই সুরজ জোরে কেঁদে উঠল। সুরজ, মিলির দেড় বছরের ছেলে, কোলে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিলি। মোবাইল বিছানার উপর পড়ে রইল। ফেসবুকে তো প্রতিদিন নোটিফিকেশন আসে, কারও জন্মদিন, কোনো মেমোরি এসবই আসে, তাই এই নোটিফিকেশনটিকেও খুব একটা পাত্তা দিচ্ছিল না মিলি। সকালের কাজকর্ম করে, সুরজকে কোলে নিয়ে টিভি অন্ করল মিলি। সকালের দিকে একটু গান না শুনলে যেন দিন কাটতে চাই না, স্কুল-কলেজেও মিলি খুব সুন্দর গান গাইত। টিভিটা অন্ করেই গানের চ্যানেল লাগাল মিলি, গান হচ্ছে ''চল রাস্তায় সাজি ট্রামলাইন"। গান শুনতে শুনতেই মনে পড়ল নোটিফিকেশনের কথা। সুরজকে পাশে শুইয়ে ওঘরে গিয়ে মোবাইলটা মিলি নিয়ে এল। ফেসবুক অন্ করেই যেন থমকে গেল মিলি। আঙুলগুলো যেন বরফ হয়ে গেল। একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল মোবাইলের দিকে। প্রত্যেক বছর এই দিনেই এই নোটিফিকেশন আসে মিলির ফেসবুকে। মিলির চোখে জল আসে, যেন কোনো এক পুরানো অতীতে ফিরে যায় মিলি। উচ্চারণ করতে থাকে পাঁচ বছর আগের মেমোরি ''ফিলিং লাভড্ উইথ সুরজ"। তারপর সুরজের দিকে তাকায়, একটু হাসে, ফেসবুক বন্ধ করে সুরজকে কোলে তুলে বারান্দায় চলে যাই। টিভিতে চলতে থাকে "দূরত্ব বাড়ে যোগাযোগ নিভে যায়"।

টিপ

রাজকুমার শেখ

সামনের আয়নাটায় এত স্মৃতি জড়িয়ে যে মালেকা কিছুতেই সেদিকে চোখ ফেরাতে পারছে না। গোটা বেডরুম জুড়ে শাকিলের উপস্থিতি এখনো বিদ্যমান। শাকিলের চলে যাওয়াটা হঠাৎ-ই ছিল। আসলে প্রতিটি মৃত্যু-ই হঠাৎ-ই ঘটে। মানুষ মন থেকে মেনে নিতে পারে না। শাকিল তেমনি চলে গেছে মালেকাকে একা ফেলে। ওদের সুবিশাল বাড়িটাতে এখন কেউ-ই থাকে না। ওদের বিয়েটা কোন ঘটা করে হয়নি। হঠাৎ-ই একদিন বিগ বাজারের সিঁড়িতে শাকিল মালেকাকে আবিষ্কার করে। তারপর থেকেই সম্পর্কটা একটু একটু করে গভীর হয়। তারপরেই দুম করে একদিন বিয়ে হয়ে যায়।

শাকিল একাই। মা-আব্বা ওর চলে গেছে অনেক আগেই। শাকিল ভালো চাকরি করত। ওর মৃত্যুটা মালেকা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। যদি ওর গর্ভে একটি সন্তান আসত? তাহলে তাকে নিয়ে ওর দিন বছর কেটে যেত। কিন্তু মানুষটি তাকে সুখ দেবার আগেই তার মনের সব ভালোবাসার সুতো ছিঁড়ে চলে গেল!

মালেকা একা বেডরুমে বসে কাঁদছে। দু'চোখে এখনো কত পানি জমে আছে কে জানে। তার কান্না শেষ হবে না মনে হয়। হাসরের দিন পর্যন্ত হয়তো ও কাঁদবে।

এ ঘরে এলেই তার সব স্মৃতি জেগে ওঠে। যেন মনে হয় এখনই শাকিল এসে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করবে। এতদিন পরও তার মনের ব্যথাটা কমেনি। শূন্য বুকটা খাঁ খাঁ করে। মন পুড়ে যায় ভাবনায়।

এমন সময় হঠাৎ ওর চোখ পড়ে আয়নায়। যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে সাজতে ভালোবাসত। শাকিল কখনও কখনও এসে তাকে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে ভরিয়ে দিত। প্রতিটি মুহূর্ত যেন এই আয়নায় লেগে আছে। তাদের সুখগুলো দেখেছে এই আয়না।

খাট ছেড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় মালেকা আয়নার সামনে। দেখছে তার প্রথম টিপটা এখনো আয়নার এককোণে যত্নে সাঁটানো। এই টিপটা শাকিলই তার কপাল থেকে তুলে সাঁটিয়ে দিয়েছিল আয়নায়।

মালেকা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর টিপটা আস্তে আস্তে তুলে তার কপালে লাগায়। টিপটা পড়ার পর আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে।

টিপটা কেমন যেন কপালে মাথায় জ্বলনি ধরিয়েছে। যেন তার কপাল পুড়ে যাবে। এমন সময় হঠাৎ আয়নায় শাকিলকে দেখা যায়। শাকিল হাত দিয়ে তার টিপ কপাল থেকে তুলে ফেলে। মালেকা এখন একটি শূন্য আয়না ছাড়া কিছু নয়।

অনন্ত পথ চলা

আমিনুর রাজ্জাক দফাদার

করুন আর্তনাদ- ঘুম আর স্বপ্ন চেপে বসেছে চোখে। আবারও কান্নার শব্দ- 'আল্লা আমাকে বাচাও। মরে গেলাম। চারিদিকে অন্ধকার রাজত্ব। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে একটা মাছরাঙা পাখির সুর। সেই সুরের ভিতর প্রাচীন রাজরাজাদের যুদ্ধ যুদ্ধ রক্ত খেলা। বাড়ির ছাদ মাথায় ভেঙে পড়তে জেগে ওঠে রজব। স্বপ্ন- এখানে রক্তের বদলে ঘামের সমুদ্র এবং প্রবল এক উত্তেজনা। রজবের স্ত্রী নাপিসার প্রসব ব্যথা। রজবকে কাতর সুরে ডাকছে ওর একমাত্র মেয়ে রাহিল - আব্বা মাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো। মা মরে যাবে। এত ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না?

বয়স চল্লিশের রজব বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান। দল ভেঙে ভেঙে নতুন দলে যোগ-! রাজনীতি এখন পোকা লাগা বেগুন। কান্না ক্রমেই বাড়ছে নাপিসার। রজব প্রতিবেশী কয়েকজনকে ডেকে সোজা হাসপাতাল -। অন্ধকার সরিয়ে আলো আনার প্রয়াস। কিন্তু রজব মনে মনে এসব কথা কেন ভাবছে। এতো ইসলাম বিরোধী-। হয়তো তেরো-চৌদ্দ বছর পর একটা আশা -। স্বাভাবিক- মন তো চায় একটা প্রদীপ জ্বলে উঠুক ঘরে। ছাড়লেই সব স্বপ্ন বৃথা। স্বপ্ন -! স্বপ্নের দৃশ্যগুলো হঠাৎ চোখে ভাসছে- মোটা বরফের চাদরে মোড়া চাঁদ। প্রবল ঝঞ্ঝা- যানবাহন সব তুলোর মতো উড়ছে। যুদ্ধের বিভীষিকাই ধ্বসে পড়ছে বড় বড় সাজানো অট্টালিকা।

- রজব ভাই, এখনি তিনটি রক্তের কার্ডের প্রয়োজন। শীঘ্র ম্যানেজ করতে হবে। ভাবির অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। কে এক কম্পিত গলাই বলে গেল।

রজবের মনে পড়েছে - স্বপ্নে একটা মানুষ কী দৈত্য রক্ত চেয়েছিল। রক্ত নাকি তার প্রধান খাদ্য। ভোরের বাতাস। হাসপাতালে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর ডালে বসে থাকা পাখিরা ডানা ঝাপটিয়ে কিচিরমিচিরের ব্যস্ত। আকাশে ক্ষীণ সূর্যের লালিমা। মন উদাস তবুও রজবের। ফোন করার আধ ঘন্টার ভিতরে রজবের শালা চারটি রক্তের কার্ড নিয়ে হাজির। সঙ্গে শাশুড়ি কান্না জড়িত কণ্ঠ-। হঠাৎ রজবের চোখে মায়ের মুখ। মা বড্ড অভিমানী ছিল তার। নাপিসার সাথে বনিবনা হত না ঠিক মত। একাই রান্না করে খেত। কত কষ্ট করে মানুষ করেছিল তাদের দুই ভাইকে। ওর আব্বা মারা যাবার পর বেছে নিয়েছিল চেলুতির জীবন -। রজবের কেবল মনে হচ্ছে সে অবাধ্য সন্তান। বুক ভেঙে অশ্রুসিক্ত চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। এমন সময় ওর গায়ে হাত দিতেই চমকে ওঠে।
- ভাই তোমার মেয়ে হয়েছে। বোনের জ্ঞান ফেরেনি। তুমি বাড়ি যাও। যদি রেফার করে-! রজবের একমাত্র শালা প্রবল উত্তেজনায় কথাগুলো বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

বিতৃষ্ণা বুকের ভেতর পাক দিলেও স্থায়ি হতে পারল না। মনে পড়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির কথা- মরুভূমির ইতিহাস-। ক্লাস নাইনের ছাত্রী রাহিল ওর আব্বার পাশে

বিমর্ষ ভাবে দাঁড়িয়ে। লজ্জায় মাথা নিচু রজবের।
পাকে পদ্ম ফুটেছে আজ। গেরুয়া রং আঁকড়ে ধরছে রজবকে। শোনাচ্ছে সতর্কবাণী। ভয়ে কেঁপে উঠছে বুক। নেকড়ে ওত পেতে আছে নাকি বাঘ না বাঘের মাসি - বোঝা মুশকিল!

মোটরসাইকেল চেপে বাড়ি ফিরছে রজব। সংসার ও রাজনৈতিক চিন্তার দানা মাথার ভিতর। কদমতলা মোড়ে চায়ের দোকানে দাঁড়াই রজব। এখান থেকে ওর বাড়ির দূরত্ব দশ মিনিট। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আকস্মিক ও দাদাজীর ছবি চোখে ভেসে ওঠে। সেই ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময়, ওর দাদী ওকে বলেছিলেন- জীবন অনন্তকাল ধরে পথ চলে।

রজব মুচকি হেসে বলে- আমরা বসন্ত ভালোবাসি। অনন্ত কালকে নয়। অল্প সময়ে জীবন এটা কখনো মানতে পারে না। কথাগুলো ভুল।

রজবের দাদাজী গম্ভীর সুরে বললেন- বসন্তের গায়ে কিন্তু আগুন লাগে। তুমি সেই বয়সে এখনো পৌঁছাওনি। তোমার গতি থেমে আছে একটা ছোট্ট পুকুরে। সমুদ্রের নোনা জলের জটিল ইতিহাস সম্পর্কে তুমি অজ্ঞাত। মাতৃগর্ভে থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে শিশু জীবনের পথ চলা শুরু করে। আলো-অন্ধকার-! প্রতিটা বাঁক লক্ষ্য করার মত। এবং সতর্ক-!

একটা বিকট আওয়াজ। মোটর সাইকেলটা উড়ে গেল। রজবের পাশ দিয়ে কড় কড় আওয়াজে একটা গুলি বেরিয়ে যেতেই রজব দৌড়ে পালাচ্ছে। আট দশ জন লোক বন্দুক বোমা রামদা হাতে পিছু ধাওয়া করেছে তার। রজব চিৎকার করছে। লোকগুলো রাগান্বিত গলাই বলছে- এই শালা দাঁড়া। তোর প্রধান হওয়ার শখ মিটাচ্ছি। রজব পুকুর পাড় দিয়ে পালাতে গিয়ে বনফুলে পা পিছলে সোজা পাঁকে। এই সুযোগে গুলি আর রামদার কোপ। রজবের বাহিনী প্রাণপণে ছুটে আসছে। রামদার কোপ বসিয়ে একজন চিৎকার করে বলল- বুথ দখল করে পঞ্চায়েত সদস্য করলাম। প্রধান হওয়ার লোভ দলত্যাগ- মর শালা। সে রজবের বাহিনীর আসতে দেখে ছুটে পালাচ্ছে।

গুলি আর রামদার কোপ খেয়ে রজব এখনো জীবিত। রজবের ভাই তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাই ভেঙ্গে পড়ে। সকলে তাকে নিয়ে হাসপাতলে। ডাক্তার তাকে রেফার করে কলকাতা মেডিকেল হাসপাতালে। ওদিকে নাপিসাকে রেফার করে এন.আর.এস হাসপাতালে। জাতীয় সড়কে দুটো এম্বুলেন্স- হর্ণ দিচ্ছে। একটাতে নাপিসা। অন্যটাতে রজব। রজবের চোখের কোণে গাঢ় টসটসে পানি। সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত। যেন মাতৃগর্ভের রক্তের দলা। রজব স্পষ্ট শুনতে পায় নদীর পাড় ভাঙার শব্দ-!

এসব খবর শুনে রাহিল স্থির। মেয়েটির কান্না তেজালো রোদের কবলে। একদৃষ্টে তাকে আকাশের দিকে। মরা চাঁদের গায়ে শকুনের ছায়া-। রাহিল যেন শুয়ে আছে ভাগাড়ে-!

দৃষ্টিকোণ

কালাম শেখ

দুম দুম দুম-

মুহুর্মুহু বোমা ফাটানোর আওয়াজ। কান ঝালাপালা করে দেয়। ক্যাশে বসে গোপাল বাবু বিচলিত বোধ করলেন। আবার দুম দুম শব্দে ফাটতে লাগল। বোমা ফাটা যেন শেষ হতে চায় না। দুম দুম দুম...। আন্দাজ করলেন মোল্লা মহল্লায়। তাহলে পাকিস্তানের কাছে ভারত হেরে গেল! তা না হলে এত বোমা ফাটে কেন? একটা আশঙ্কা গ্রাস করল গোপাল বাবুর ভাবনাকে। মনে মনে আওড়ালেন, দেশে বাস করছে আবার দেশ হেরে গেলে বোমা ফাটাচ্ছে। যত সব... নিমকহারাম নিমকহারাম।

গোপাল বাবুর বরাবরই ক্রিকেটপ্রেমী। চাকুরি পাওয়ার আগে ক্রিকেট নিয়ে থাকতেন। এখন আর সময় হয়ে ওঠে না। তবে ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসাটা মরেনি। এখনও ভারত পাকিস্তানের খেলা হলে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ক্যাশে বসলেও মন পড়ে থাকে খেলায়। আজ ছিল সেই উত্তেজনাকর ভারত পাকিস্তানের খেলা। ভেবেছিলেন বাড়িতে থেকে খেলাটা দেখবেন। কাজের চাপে সে সুযোগ আর আসেনি। ক্যাশে বসেও দেখার ফুরসুত নেই। সারাদিন মানুষের ভিড় শেষ হতে চায় না।

অফিস থেকে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন গোপাল বাবু। ভিতরে উত্তেজনা ফুটছে। বাড়ি গিয়ে বসে পড়বেন টিভির সামনে। খেলার শেষটুকু যদি দেখা যায়। এবার বোমা ফাটতে লাগল এক নাগাড়ে। থামতে চায় না। ইস্ পাকিস্তান জিতে গেল! ধড়াক করে উঠল বুকটা। আজ বিশ্রী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। মোল্লা মহল্লার ছেলে ছোকরারা চেপে ধরে বলবে, কাকু পাকিস্তান জিতেছে মিষ্টি খেয়ে যান। ভাবতে গিয়ে রেগে গেলেন। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কয়েকটা অসাবধানী কথা। - এরা কবে দেশটাকে ভালোবাসতে শিখবে।

মোল্লা মহল্লায় ঢুকে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন গোপাল বাবু। মহল্লায় উৎসব মুখর পরিবেশ। গান বাজছে। বোমা ফাটছে। নাচছে ছেলেরা। মহামেডান ক্লাবের কাছে এসে থমকে গেলেন। রাস্তা পর্যন্ত শামিয়ানা টাঙানো। চেয়ার পাতা। খাওয়া-দাওয়ার ধুমধাম আয়োজন। গোপাল বাবু কাটলেন, ছিঃ ছি-ই ছি ছি ছি এরা দেশটাকে পা...
গোপাল বাবুর সব ভাবনা গুঁড়িয়ে দিয়ে একদল যুবক এসে ছেঁকে ধরল।

কাকু, আজ আপনাকে যেতে দেব না

কেন?

আমরা জিতেছি কাকু। আনন্দের দিনে আপনি আমাদের সাথে খাবেন না?

গোপাল বাবু ভিতর ভিতর চটে গেলেন। এরা পাকিস্তানের জেতাকে নিজেদের জেতা ভাবে। বললেন, আমি বাবা এসব খাবোনা। আমাকে যেতে যাও।

- ছেলেরাও নাছোড় বান্দা, কাকু, পাকিস্তানকে ভারত পাঁচ উইকেটে হারিয়েছে। সেই উপলক্ষে আমরা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছি। আজ আপনাকে না খেয়ে যেতে দেব না। ছেলেরা গোপাল বাবুকে ধরে ক্লাবের দিকে টানতে লাগল। আর একটা বোমা ফাটলো দুম করে। গোপাল বাবু সম্বিত ফিরে পেলেন। দেখলেন, ক্লাবের উপরে ভারতের জাতীয় পতাকা পতপত করে উড়ছে। মাইকে গান বাজছে - সারা জাঁহাসে আচ্ছা...।

মুর্শিদাবাদ ও এক ব্রাহ্মণের গল্প

চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

ঐ যে গো আমাদের ব্রহ্মপুরে-। বিষ্ণুপদ আচার্য চা-এ চিনি ঘুঁটতে ঘুঁটতে বলল, ধর্ম নিরপেক্ষতার চাষ হয়।

তাজুদ্দিন আহমেদ একবার ভ্রু কুঁচকে তাকাল। পরখ করবার চেষ্টা করল, ওদের এই কর্মকাণ্ডকে বিষ্ণুদা ব্যঙ্গ করছে না তো। বিষ্ণুপদ'র চোখের ভাষায় তেমন কিছু খুঁজে পেল না। তাজুদ্দিন আহমেদ ওরফে রোদ্দুর কল্যাণী ইউনিভার্সিটি ছাত্র লিডার। আজ এই চায়ের দোকানে গুটি কয়েক, তার ফলোয়ার্স নিয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও বিপন্ন শীর্ষক আলোচনা ও একটি পুস্তিকা প্রকাশ করবার জন্য- আলোচনায় মেতেছে। আর সেই আলোচনার বিষ্ণুপদ আপন মনে বলে উঠল, আমাদের ব্রহ্মপুরে ধর্ম-নিরপেক্ষতার চাষ হয়।

বিষ্ণুপদ আচার্য শুধুমাত্র কল্যানী শিল্পাঞ্চলের চায়ের দোকানদার নন। তিনি একজন কবি, ইতিহাস ও সাহিত্য পিপাসু, এ্যাকাডেমিক ডিগ্রিহীন স্বশিক্ষিত মানুষ। তাই কল্যাণীর এতদ অঞ্চলের কবি সাহিত্যিক ও কল্যাণী ইউনিভার্সিটির পড়ুয়া উদিতমান কবি, গল্পকারদের প্রিয় আড্ডার স্থল তার চায়ের দোকান। মুর্শিদাবাদের পড়ুয়াদের তিনি ঠেকা বে-ঠেকায় ভরসাস্থলও বটে।

তাজুদ্দিন ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, বিষ্ণুদা আমাদের পত্রিকায় তোমাকেও লিখতে হবে, 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও বিপন্ন এই সময়' এই বিষয়ে।

দু'ছত্র কবিতা বলো লিখতে পারি, কিন্তু প্রবন্ধ নৈব নৈব চ।

এই যে বললে তোমাদের ব্রহ্মপুর ধর্ম-নিরপেক্ষতার চাষ হয়। ওটাকেই দু-চার কথা লিখে দাঁড় করিয়ে দাও। মুর্শিদাবাদে ব্রহ্মপুর কোথায়?

১৫০৫ সাধারনাব্দে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, ৩৩ পরবর্তী কালে ভাগীরথী খাত পরিবর্তন করে। সেই সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিম অবস্থিত, ব্রহ্মপুর নামক একটি গ্রাম ভাগীরথীর পূর্বকুলে আশ্রয় নিল।

সে গ্রামটি কোথায়?

ভাগীরথীর পূর্বকূলে আশ্রয়প্রাপ্ত সেই গ্রামটিই আজকের - বহরমপুর।

বা হো। ব্রহ্মপুর গ্রামের নামানুসারে আমাদের বহরমপুর শহর। কিন্তু ধর্ম-নিরপেক্ষতার চাষ?

তা হলে দুটো গল্প বলতে হয়, একটি সামসা, খালেকের অপরটি রেজাউল করিম সাহেবের।

সূর্য তখন পাটে বসেছে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠল। কল্যাণী শিল্পাঞ্চলের এই ছোট্ট চায়ের দোকানে, ছেলেগুলো মৌচাকের মতো ঘনবদ্ধ হয়ে বসল।

তোমরা নিশ্চয় তিন দিনের ব্যবধানে মুর্শিদাবাদের দু'বার স্বাধীনতার কথা জানো। সাত চল্লিশের সেই সময়, মুর্শিদাবাদ জেলায় মেরে-কেটে পনেরো ষোল লাখ মানুষ বাস করত। তারমধ্যে তিন ভাগ মুসলমান, এক হিন্দু। ব্যারাকের স্কোয়ার ফিল্ডে গ্রীষ্মের শুরু থেকে বর্ষার শেষ পর্যন্ত, যতদিন না বানের জলে ব্যারাকের মাঠ ভেসে যায়, ততদিন দুমদাম ফুটবল চলত। কখনো গোরাদের সঙ্গে দেশীয়দের খেলা। কখনো হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের খেলা। বাহার ঠিকাদারের ছেলে সামসা ও তার বন্ধু খালেক, সব খেলাতেই থাকত। শোনা যায় অত বড় স্কোয়ার ফিল্ড, সামসা খালেক শট মেরে এপারের বল ওপারে ফেলতে পারত। ফিজিক্যাল ট্রেনার রুস্তমের তত্ত্বাবধানে এক একজন স্বাস্থ্যবান সোহারব হয়ে উঠেছিল। বহরমপুর শহরের উপ-পৌরপিতা আব্দুল গনি, হিন্দুপ্রধান খাগড়া থেকে ভোটে জিতে আসা কমিশনার আমিরুদ্দিন খান, দানিবাবু, শ্যাম ভট্টাচার্য, ওদের রীতিমতো ফ্যান ছিলেন। সেই সামসা খালেকের নেতৃত্বে উভয় সম্প্রদায়ের যুবকরা অগ্নিগর্ভ- সেই দিনে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালতে দেননি।

এই তো লিখে দাও, ব্রহ্মপুরে ধর্ম-নিরপেক্ষতার চাষ।

না, আমার লেখার শিরোনাম হবে - মুর্শিদাবাদ ও এক ব্রাহ্মণের গল্প। বিষ্ণুপদ'র দু-চোখে আগুনের প্রত্যয়, ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, এবার তোমাদের এক ব্রাহ্মণের গল্প শোনাব। ক্ষীণদেহি, নির্লোভ, শিক্ষাব্রতী ও জাতির বিবেক রেজাউল করিমের কথা। উনি লিখেছিলেন, মুসলমানের স্বার্থের নামে দল গঠন করলে তাহাতে সাধারণ মুসলমানের হিত হইবে না। তাহাদের হিতের জন্য সমস্বার্থ বিশিষ্ট অমুসলমানদের সহিত মিতালি করতে হইবে।

কৃষ্ণনগর টাউনে চারণকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় স্বীয় পত্নী ইলা চট্টোপাধ্যায় এবং কন্যা বানি ও করিম সাহেবের নিমন্ত্রণ ছুটে গেল। পংক্তি ভোজনের সময় বাঁধল বিপত্তি, গৃহস্বামী সকলের জন্য এক পংক্তি আর মুসলমান করিম সাহেবের জন্য অন্য একটি আসন আনল।

ইলা দেবী প্রশ্ন তুললেন, এমন দ্বিচারিতা কেন? গৃহকর্তা যুক্তি দিলেন উনি মুসলমান তাই। প্রথমেই ইলা দেবী, কন্যা বানি - একে একে সকলে যে যার আসন তুলে সেই মুসলমান ব্রাহ্মণের পাশেই বসলেন। অন্য পংক্তি ফাঁকায় রয়ে গেল। সেই দিন প্রমাণ হল সংস্কৃতির কোন সম্প্রদায়িক নাম হয় না।

গল্পের টানে সকলে আরো ঘনবদ্ধ হল। বিষ্ণুপদ পুনরায় বলতে শুরু করল, ভদ্রে এই সময়ের কবি, যাঁরা শঙ্খ ঘোষের বৈঠকখানায়, বর্ধমানের বিশেষ সুগন্ধযুক্ত চালের চিঁড়ে ভাজা সহযোগে, খাঁটি দার্জিলিং চা না পান করেছেন, তাঁর জীবন ষোল আনায় বৃথা। সেই শঙ্খ ঘোষ একদিন বুনো রামনাথের খোঁজ পেলেন বহরমপুরে। তিনিও তখন বহরমপুর গার্লস কলেজের শিক্ষক। কথায় কথায় জানতে পারলেন, এখনো পোঁচাত্তর টাকায় মাইনেতে এক যুগের অধিক কালে ধরে পড়িয়ে চলেছেন, এই সময়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মুক্ত বুদ্ধির লেখক। আর নতুন নতুন জয়েন করা শিক্ষকদের মাসিক মাহিনা

একশত কুড়ি টাকা। উনি হৈ চৈ করতেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। পরিচালন সমিতির সদস্যরা একপ্রস্থ যারপরনাই বিব্রত ও লজ্জায় পড়লেন। ভুল স্বীকার করে মাহিনার সমতা আনলেন। যার জন্য এত সব কিছু, তিনি বললেন, এ সবের কি প্রয়োজন ছিল। আমি তো একাই মানুষ, কতটুকুই বা আমার প্রয়োজন।

এই শিক্ষাব্রতী ছাত্র বৎসল, স্বল্পে তুষ্ট, এই সময়ের বুনো রামনাথ হচ্ছেন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ রেজাউল করিম।

এক দঙ্গল নবীন কবিদের চোখের দিকে চেয়ে বিষ্ণুপদ পুনরায় বলল, একবার হল কি ঐ কলেজের অধ্যাক্ষা দেখলেন, তাঁর টেবিলে একগুচ্ছ ছুটির আবেদন। মনে মনে বললেন, এ তো দেখছি গণ ছুটির আবেদন। তিনি মেয়েদের ডেকে বললেন, সকলে একসাথে ছুটি চাইছ কেন?

দিদিমণি আমাদের শিবরাত্রির ব্রত আছে। সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যায় সৎ ব্রাহ্মণের পায়ে অর্ঘদান করে জলস্পর্শ করতে হয়। এখানে ব্রাহ্মণ কোথায় পাবো তাই বাড়ি চলে যেতে চায়।

কেন তোমাদের চোখের সম্মুখে তোমাদেরই এক নিরলস শিক্ষাবর্তী শিক্ষক, যিনি প্রতিনিয়ত মাতৃজ্ঞানে মা সম্বোধনে তোমাদের আপ্যায়িত করেন। তিনি কি সেই সৎ ব্রাহ্মণ নন।

মেয়েরা সেই সন্ধ্যায়, সেই শিক্ষাব্রতী স্বল্পে তুষ্ট, মুক্ত বুদ্ধির লেখক, এই সময়ের বুনো রামনাথের চরণ বন্দনা করল।

আমি কার কথা বলছি বলো তো, কে সেই ব্রাহ্মণ?

মন্ত্রমুগ্ধ তাজুদ্দিন ও তার বন্ধুরা এক বাক্যে স্বীকার করল - সেই সৎ ব্রাহ্মণের নাম রেজাউল করিম।

সংবাদপত্র ভাবনায় বিদ্যাসাগর

তাপস মুখোপাধ্যায়

সংবাদপত্র ভাবনায় বিদ্যাসাগরের উপস্থিতি জনমানসে তেমন তরঙ্গ সৃষ্টি করে না। লেখক, পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা ইত্যাদি বলেই আমাদের কর্তব্য সারি। বাস্তবিকই পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা হিসেবে বোধ হয় বাংলা ভাষায় যেকোন শিশু তার পাঠ শুরু করেছে বা করবে প্রত্যেকে আজীবন ঋণী থেকে যাবে। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যে বাসুদেব চরিত সহ ২৭টি বই সম্ভবত ছদ্মনামে আরও পাঁচটি, সম্পাদিত সংস্কৃত বাংলা মিলিয়ে ১২টি বই বাংলা ভাষার অসমতল ভূমি থেকে মসৃণ পথে পৌঁছে দেওয়ার এক বিপদসঙ্কুল বাঁক অতিক্রম করে দিয়েছেন সন্দেহ নেই।

বাংলা ভাষার এই আদি স্রষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে কুণ্ঠা করেন নি। তাঁর বাল্য জীবনের শিক্ষারম্ভ কালের কথা স্মরণ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের 'জল পড়ে পাতা নড়ে' কে আদি কবির প্রথম কবিতা বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন, বাংলা আধুনিক কালের ঊষালগ্ন। সেখানে পাদ্রি উইলিয়াম কেরির বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্তি বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আশীর্বাদ ছিল। বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা সে বিদ্যাসাগরই হোক, রামরাম বসুই হোক, রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়ই হোক, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই হোক সবটাই বাংলা ভাষার পক্ষে সময়োচিত পদক্ষেপ। বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত পর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সময়ের চাহিদায় পাঠ্যপুস্তক রচনা শুরু করেন আরও অনেকের সঙ্গে এ তথ্য আমাদের জানা।

কিন্তু সংবাদ সাহিত্যের আলোচনা বা বাংলায় সাংবাদিকতার আদি যুগে তো বিদ্যাসাগরের নীরব পদচারণ আমাদের চমকে দেয়। তিনি বাংলা সাংবাদিকতা চলার পথের শুরুর দিনগুলিতে পৃষ্ঠপোষক উদ্যোগ সহানুভূতিশীল। এছাড়াও লেখনীতে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার দিকে নজর না দিয়েই আমরা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়।

বেশ কয়েকটি পত্রিকার জন্ম ও সংগঠনটি তাঁর হাতেই তৈরি ছিল। আবার কোনটি তাঁর পরিকল্পনা ও আদর্শের অনুগ করে গড়ে তোলার চেষ্টাতে তিনি থাকলেও সময় অভাবে বা আদর্শ রূপায়নে পূর্ণ সহযোগিতা না মেলায় সসম্মানে সরে এসেছেন।

প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা থাকার সূত্র ধরে চারটি পত্রিকা তো উল্লেখ করতেই হবে। সেগুলি হল 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ' ও ইংরেজি পত্রিকা হিন্দু 'প্যাট্রিয়ট পত্রিকা'। প্রথমটি না হলেও বাকি তিনটি পত্রিকা বাঙালি পরিচালিত সেরা গুনমানের পত্রিকা। তাই বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ তিনটি পত্রিকাকে স্মরণ করা হয়।

১৮৪৩ সালের ১৬ ই আগস্ট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত বারো বছর একনাগারে এর

সম্পাদক ছিলেন। তিনি মাসিক ৩০ টাকা বেতন পেতেন। শেষে তা বাড়তে বাড়তে গিয়ে ৬০ টাকায় পৌঁছায়। পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্রাহ্ম সমাজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয় এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার সাধন ঘটে। বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন - দূরের বা অসুস্থ ব্রাহ্ম আদর্শের কথা পৌঁছে দেওয়া কুকর্ম থেকে নিবৃত্ত করতে ব্রাহ্মজ্ঞানের প্রসার, মাহাত্ম্য রামমোহনের লেখা বইগুলোতে যে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ছিল তা প্রচার ইত্যাদি। পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী আবেদন ছিল জনমানসে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত চলে। শেষ সম্পাদক ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, নবীন বন্দোপাধ্যায় এর সম্পাদক ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল গভীর। পত্রিকা সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতে একটি পেপার কমিটি ছিল যারা এই পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার আগে লেখাগুলি আলোচনা, পর্যালোচনা, প্রয়োজনে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করতেন। কমিটির সভ্যতার প্রথম নামটি ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। এছাড়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, রাধাপ্রসাদ রায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন এই কমিটিতে। এমন সুযোগ্য পরিচালন কমিটি ও সম্পাদকের প্রচেষ্টা দুয়ে মিলে এক আদর্শ পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। পত্রিকায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব বিষয়েও বহু সুলিখিত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় - "তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইয়াল..." বাস্তবিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্তি সহকারে আলোচনা প্রকাশে তত্ত্ববোধিনী সুস্থ মনের ও গাম্ভীর্যপূর্ণ উচ্চমানের পত্রিকা হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৫০ সালের আগস্ট মাসে 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঠিকানা ছিল ঠনঠনিয়া রামচন্দ্রের ৫৮ সংলক ভবন। ঐ বাসভবনেই এক সভায় এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা ও পরে প্রকাশ পায়। ওই এক মতালম্বীদের উদ্দেশ্য ছিল 'বহুকালবধি আমাদিগের দেশে কতগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে, তদ্বারা এতদ্দেশের বিষন অনিষ্ট ঘটিতেছে, ও কালক্রমে সর্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নির্মিত্ত ---- ও দূরীভূত হয় সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে সঙ্গ করা যাইবেক।"

(বাংলা সাময়িক পত্র।। ১ম খন্ড।। পাতা -১১৪, ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

পত্রিকার কোন দাম নির্ধারণ না করে কমপক্ষে চার আনা দান করতে আহ্বান জানানো হয় পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষ থেকে। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকার প্রকাশকাল ঘোষিত ছিল মাসিক হিসাবে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বাল্য বিবাহের দোষ' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ। দ্বিতীয় সংখ্যায় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'স্ত্রী শিক্ষা' উপর প্রবন্ধ ছিল। এ তথ্য মেলে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত থেকে। আসলে দুই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়। তৃতীয় সংখ্যায় মাংসাহারের বিরুদ্ধে লেখা প্রকাশ পেয়েছিল। চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল ১৮৫১) প্রকাশিত হয়। তারপরই প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আবার পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে। বিদ্যাসাগর তখনও পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা খবর পাওয়া যায় না। তবে পত্রিকাটি তাঁর আদর্শ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল শেষ দিন পর্যন্ত বলে মনে করা হয়।

আবারও শিবনাথ শাস্ত্রীর মতামত দিয়ে বলা যায়, 'শুনিয়াছি সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাবে প্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাভূষণ নিকট উপস্থিত করেন'। আর পাঠক সমাজে এর প্রভাব সমন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়কে বলতে দেখি 'দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িত। 'প্রভাকর' ও 'ভাস্কর' প্রভৃতি বঙ্গ সমাজের নৈতিক বায়ুকে দূষিত করিয়া দিয়াছিল, সোমপ্রকাশের প্রভাবে তাহা দিনদিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমবার আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত... আকর্ষণ এতদূর প্রবল ছিল যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ কাগজ বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা এবং তাহাও অগ্রিম দেয়। বাস্তবিক দশটি টাকা অগ্রে প্রেরণ না করলে কাহাকেও একটি কাগজ দেওয়া হইত না।'

১৮৬২ সালের এপ্রিল মাসে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় কলকাতার চাঁদতলা থেকে প্রথম পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সোমপ্রকাশেই প্রথম রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে ভার্নাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট জারি হয়। রাজরোষে পড়ে সোমপ্রকাশ এক বছর বন্ধ থাকে। আবার ১৮৮০ সালের ১৯ শে এপ্রিল নতুন করে আবার শুরু হয়, ১৮৮৬ সালের ২৩ শে আগস্ট বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হয়।

১৮৫১ সালে ভার্নাকিউলার লিটারেচার কমিটি প্রতিকিত সচিত্র কাগজ 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর ঐ কমিটির সভ্য ছিলেন। সভ্যদের মধ্যে প্রথমেই বিদ্যাসাগরের নাম দেখা যেত। এছাড়া সভ্য ছিলেন রাধাকান্ত দেব, হজসন প্র্যাট, পাদরি লং, সীটনকার প্রমুখেরা। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু ঘটে।

সাংবাদিকতার রঙ্গনে বিদ্যাসাগরের পরবর্তী কর্মক্ষেত্র ছিল 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর পত্রিকার দুর্দিনে পত্রিকাটির হাল ধরেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের সম্মতিতে কালীপ্রসন্ন সিংহ পত্রিকাটির স্বত্ত্ব কিনে নেন। এবং বিদ্যাসাগরকেই পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তখন বিদ্যাসাগর কিশোর কৃষ্ণদাস পালকে সম্পাদক নিযুক্ত করে পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। যদিও হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিন পত্রিকাটি চালিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস পালের নাম সম্পাদক থাকলেও পত্রিকা চালাতেন বিদ্যাসাগর। কিছু দিন চালানোর পর কৃষ্ণদাস গোপনে কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছে রক্ষণশীল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ানদের মুখপত্র করার প্রস্তাব রাখেন। বিদ্যাসাগর মতাদর্শগত প্রগতিশীল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ানদের আদর্শে তাদেরই মুখপাত্র হিসাবে কাগজ চালচ্ছিলেন। গোপনে এই বিরোধিতার কথা জানতে পেরে তৎক্ষনাৎ পত্রিকা থেকে পদত্যাগ করেন।

বাস্তবে অক্ষয় কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও উপদেশে সাংবাদিকতা সুচারু করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরে কৃষ্ণদাস পালকে উৎসাহ উপদেশ দিয়ে এ পেশায় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আদর্শ এবং দৃষ্টি ভঙ্গিকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ রাখেন। মত বিরোধ ঘাটে একমাত্র কৃষ্ণ দাস পালের ক্ষেত্রে। অন্য দুই সম্পাদকের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ জীবন পর্যন্ত অটুট ছিল বলে খবর।

মহারানি স্বর্ণময়ী দেবী

(১৮২৭-১৮৯৭)

অর্ণব বড়াল

মুর্শিদাবাদ জেলার মহীয়সী নারীদের মধ্যে মহারানি স্বর্ণময়ী দেবী অন্যতমা। তিনি ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে (১২৩৬ বঙ্গাব্দের ২৬ অগ্রহায়ণ) বর্ধমান জেলার ভাটাকুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্ণময়ীর পিতার নাম রামতনু মণ্ডল। স্বর্ণময়ীর পূর্বনাম ছিল সারদাসুন্দরী। কাশিমবাজার নন্দী রাজবাড়ির রাজা হরিনাথ ও রানি হরসুন্দরী অপরূপা সারদাসুন্দরীকে পুত্র কৃষ্ণনাথের বধূ নির্বাচিত করে কাশিমবাজার শ্রীপুর প্রাসাদে নিয়ে আসেন। 'কান্তনামা' গ্রন্থে স্বর্ণময়ীর রূপের বর্ণনা এইভাবে দেওয়া হয়েছে :

'রূপের ছটাতে ঘর হইল উজ্যল
সোবর্ন্ন পুতলি তনু করে ঝলমল।।
বদনে জল-এ সসি প্রথক দুই ভুরু,
ললাট উপরে রবি বিরাজিত চারু ।।
পূর্ণিম্মার চন্দ্র জিনি জেন মুখ সাজ
কমল বিকসিত জেন সরবরের মাজ।।'

মাত্র এগারো বছর বয়সে ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সারদা সুন্দরীর সাথে রাজা কৃষ্ণনাথের বিবাহ হয়। কৃষ্ণনাথ তাঁকে 'স্বর্ণময়ী' নাম দিলেন। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মুর্শিদাবাদ কথা' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন :

'... স্বর্ণময়ী জগতের সারদ্রব্য অর্থদান পূর্বক পৃথিবীতে সারদা নামই সার্থক করিয়া গিয়াছেন।'

স্বর্ণময়ী মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে মাতৃত্বের স্বাদ লাভ করেন। তাঁদের প্রথম সন্তানের নাম লক্ষ্মীমণি। অপর সন্তান সরস্বতীমণি। তবে স্বর্ণময়ী ও কৃষ্ণনাথের দাম্পত্যজীবন দীর্ঘ হয়নি। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর রাজা কৃষ্ণনাথ মাত্র ২২ বছর বয়সে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাসভবনে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার পূর্বে কৃষ্ণনাথ স্ত্রী স্বর্ণময়ী এবং মাতা হরসুন্দরীর জন্য সামান্য মাসোহারার বন্দোবস্ত করে সিংহভাগ সম্পত্তিই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে দান করে একটি উইলে স্বাক্ষর করেন। এই উইল নিয়ে তীব্র জটিলতার সৃষ্টি হয়। প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, পরে শাশুড়িমাতা হরসুন্দরী এবং সবশেষে ব্রিটিশ সরকার স্ব-স্ব দাবি জানিয়ে সম্পত্তির অধিকার কায়েম করতে এগিয়ে আসে। তবে মাননীয় শ্রী রাজীবলোচন রায় এবং শ্রীরামপুরের বিখ্যাত অ্যাটর্নি শ্রী হরচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে স্বর্ণময়ী স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার পান। আদালতে লড়াই করে প্রাপ্য যে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করলেন - তা আত্মভোগের জন্য নয়, প্রজা-জনগণ হিতার্থে উৎসর্গ করলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘ ৫৩ বছর আমৃত্যু তিনি

মুক্তহস্তে দান করে এক অনন্য ইতিহাস রচনা করে গেছেন।

স্বর্ণময়ী মূলত শিক্ষার প্রসারের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ব্যবস্থা, নাগরিকদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা, ছাত্রছাত্রীদের অকাতরে তাঁর দান বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দানের সম্পূর্ণ তালিকা করা অসম। শিক্ষা প্রসারে যে বিপুল অর্থ প্রদান করেছেন - তার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা নিচে দেওয়া হল :

১. কৃষ্ণনগর কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ - ৩০ বিঘা জমি।
২. কৃষ্ণনাথ কলেজ - ৪,০০০ টাকা।
৩. মেদিনীপুর হাই স্কুল - ১,০০০ টাকা।
৪. কলকাতা বেথুন কলেজ - ১৫,০০০ টাকা।
৫. বগুড়া ইনস্টিটিউশন - ৫০০ টাকা।
৬. রাজশাহি মাদ্রাসা - ৫,০০০ টাকা।
৭. কটক কলেজ - ২,০০০ টাকা।
৮. হিন্দু গার্লস স্কুল - ১০,০০০ টাকা।
৯. ওরিয়েন্টাল সেমিনারি - ৩,০০০ টাকা।
১০. রংপুর হাই স্কুল - ৪,০০০ টাকা।
১১. মিস্ মিলমান স্ত্রী শিক্ষালয় - ১০,০০০ টাকা।
১২. আলিগড় কলেজ - ২,০০০ টাকা।
১৩. জিওলজিক্যাল সোসাইটির বাগান - ১৪,০০০ টাকা।
১৪. সংস্কৃত কলেজ - ৮,০৫০ টাকা।
১৫. ভারতীয় মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা খাত - ৩,০০০ টাকা।
১৬. খাগড়া L.M. School উন্নয়ন খাত - ৫,০০০ টাকা।
১৭. হিন্দুকুষ্ঠ রোগাক্রান্ত নারীদের হোস্টেল তৈরি - ৮,০০০ টাকা।
১৮. লন্ডন ইম্পিরিয়াল জুবিলি ইনস্টিটিউশন - ৫,০০০ টাকা।
১৯. হিন্দু হোস্টেল, কলকাতা - ৪,০০০ টাকা।
২০. কলকাতা চাঁদনী হাসপাতাল - ১,০০০ টাকা।
২১. কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ - ১,৫০,০০০ টাকা।
২২. টেকনিক্যাল স্কুল মুর্শিদাবাদ - ২০,০০০ টাকা।
২৩. নেটিভ হসপিটাল - ৮,০০০ টাকা।
২৪. বহরমপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সূচিশিল্প শিক্ষার্থে - ১,০০০ টাকা।
২৫. রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কৃতি ছাত্রদের বৃত্তি বাবদ - ৫,০০০ টাকা।
২৬. পুস্তক প্রকাশ করা বা মুদ্রণের নিমিত্ত - ৩,০০০ টাকা।

এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে সন্দেহ নাই। শিক্ষা-স্বাস্থ্য নয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত অসহায় মানবসেবায় দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও সাহায্যের হাত প্রসারিত

করে তাঁর নাম ইতিহাসে অমর করে রেখেছেন। তাঁর দানের কয়েকটি উল্লেখ না করলেই নয়। এই তালিকায়ও আংশিক :

১. Donation for famine relief and other associted matters in Rangpur and Murshidabad - ২,০০,০০০ টাকা।

২. Misc.Charities of the usal Nature - ২,০০,০০০ টাকা।

৩. American Famine Relief Fund - ১০,০০০ টাকা।

৪. Irish famine relief fund - ১০,০০০ টাকা।

৫. Madras relief fund - ১,০০০ টাকা।

৬. Oriental seminari - ৩,০০০ টাকা।

৭. Temple native asylum - ১,০০০ টাকা।

৮. Victims of the fire in Bankura and Nabadwip - ১,০০০ টাকা।

এছাড়া শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য জমি দান করেছিলেন। একদিকে শিক্ষাপ্রসার আর অন্যদিকে জনসেবার মধ্য দিয়েই জীবিতকালেই স্বর্ণময়ী নিজেকে যথার্থই 'মহীয়সী'তে উন্নীত করেছিলেন। বহরমপুর শহরে তৎকালীন প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ‘রানিকল’ নির্মাণ করেন।

মহারানি স্বর্ণময়ীর বিপুল দান মূলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ও জনকল্যাণের হিতে তিনি ‘মহারানি’ খেতাব লাভ করেন। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ আগস্ট কাশিমবাজার রাজবাড়িতে দরবার অনুষ্ঠানে কমিশনার মি: মোলোনের সভাপতিত্বে ঐ সনদ প্রদান করা হয়। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ‘ক্রাউন অফ ইন্ডিয়া’ উপাধিতে ভূষিত হন। সমগ্র বাংলাদেশে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি এই উপাধি লাভ করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৫ আগস্ট সৈদাবাদ রাজবাড়িতে এই বীরাঙ্গনা নারীর জীবনাবসান হয়।

উনবিংশ শতাব্দির বাংলায় নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্ণময়ী সম্পর্কে স্তুতি দিয়ে এই প্রবন্ধের ইতি টানব -

‘... দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তি সর্বসম্মত প্রশংসনীয় গুণ। এই দুই গুণ সংসারে অতি বিরল। কিন্তু শ্রীমতীর কার্য পরম্পরা নিরন্তর এই দুই প্রশংসনীয় গুণের সবিস্তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এমনস্থলে শ্রীমতীর প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা না জন্মিবেক, অথবা শ্রদ্ধা বিচলিত হইবেক, তিনি নিতান্ত পামর, কিমধিকমতি।’

আমি বাঁচতে চাই

সুস্মেলী দত্ত

দুই? না না তিন? ... চার? ... উফ আবার ভুল বলছি মনে হয় ওই তিনজনেই... তুমি অবশ্য ছিলে না ওদের মধ্যে। না না কৌস্তভ তুমি খুব ভালো ছেলে... তুমি ছিলে কি? না না তুমি সেখানে ছিলে না মনে হয়, আর সবাই কিন্তু ছিল... আহ্ আহ্ মাথাটা যেন যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে, তবুও ওদের মুখগুলো কেন জানিনা মনে করতে পারছি না। একটু আগে পুলিশ এসেছিল, তারপর ডিটেকটিভ কত কি জিজ্ঞেস করল আমি কিন্তু কিচ্ছুটি বলিনি। ওদের সঙ্গে তুমি, না না আবার ভুল কি ভাবছি, তোমার মত দেখতে একজন জুনিয়র ডাক্তারও এসেছিল, কি যেন সে বলছিল বিড়বিড় করে। আমি শুনতে পেয়েছি, কিন্তু বুঝতে পারলাম না ওর কথাগুলো। কি জানি, আজকাল কোনো কিছু বুঝতে এতটা কেন সময় লাগে? মনে হয়, পৃথিবীর সর্বত্র যেন অসভ্যের মতো অনর্থক কোলাহল। আহ্ আহ্... চুপ চুপ করো না তোমরা... উফ সকলে কেন যে আজকাল এত কথা বলে, চেঁচায়, কান দুটো যেন ঝালাপালা হয়ে যায়। আজকাল আবার মা ও চেঁচায়। উফ্ মা নয়, আবার ভুল বলছি ওই মোটা ধুমসি আয়াটা। ইসস ওষুধ না খেলে জানো তো কৌস্তভ, কি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে আমাকে! অথচ সেই আয়া দিদিই আবার আমার বাড়ির লোকের কাছে ভিজে বেড়ালটি যেন, কি আশ্চর্য!

বিড়াল? হি হি... ওই নামেই তো আমাকে তুমি ডাকতে মাঝে মাঝে। মনে আছে, চ্যাট করার সময় কি যেন বলতে, হ্যা হ্যা মনে পড়েছে - মিনি, ম্যাও এরকম কত নাম। আর তুমি নিজেকে? হি হি হি সিংহ বলতে। তোমার নাকি জোডিয়াক সাইন লিও। বলতে তাই নাকি তোমার এত রোয়াব। বলতে, সিংহ রাশির লোকেরা নাকি মনের দিক থেকে তুলতুলে নরম হয়। তা বটে! এতটাই নরম যে, আমাকে এই অবস্থায় হয়তো তোমার দেখতে কষ্ট লাগবে, তাই তুমি একদিনও হাসপাতালে আমাকে দেখতে পর্যন্ত আসোনি। জানো কৌস্তভ, রোজ মা আসে, দাদা মাঝেমধ্যে আসে আর বৌদি তো সেই কবে এসেছিল। আমার ভাইপো ভাইঝি দুটো যমজ, সবে কথা বলতে শিখছে জানো, ওরা আসেনি একদিনও। অবশ্য কি করেই বা আসবে, তারা দুধের শিশু সব...। মনে আছে, 'ওদেরকে না পিসি' ডাকটা খুউব ধৈর্য ভরে শিখিয়েছিলাম। জানো, মা সেদিন বলল, বৌদি নাকি ফিসফিস করে এর মধ্যে একদিন দাদাকে বলছিল যে আমি নাকি সুস্থ হলে আমাকে ওরা শহর থেকে অনেক দূরে একটা হোমে পাঠিয়ে দেবে, যেখানে অনাথ মেয়েরা থাকে। কিন্তু আমি তো অনাথ নই, আমার মা আছে, দাদা বৌদি, আত্মীয়-স্বজন, সবাই আছে। হ্যা, অবিশ্যি বাবা নেই। বাবা বেঁচে থাকলে কি বৌদি এমন কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারতো?

- বাবা, ও বাবা তুমি কোথায়? মা বলে, মরে গেলে মানুষেরা তারা হয়ে যায়। তাই তো তারাদের হাতে গোনা যায় না, অগুনতি। বাবা, তুমি কোন তারা হয়ে গেছ? ওই যে, কালপুরুষের পাশাপাশি যে তারাটা সবচেয়ে জ্বলজ্বলে... সেটা, যাকে নাকি মাঝে মাঝে

থাকে পুব আকাশে দেখি, হ্যা হ্যা একটা বড় গোল চাকতির মত আলো... যেটা মাঝে মাঝে দপদপ করতে করতে কখনও কখনও মেঘের মধ্যে টুক করে লুকিয়ে পড়ে, আবার পরক্ষণেই সেটা ঝকঝক করে দাঁত বের করে হাসতে থাকে! ঠিক যেমন তুমি হাসতে– বাবা, ও বাবা, ওটাই যে তুমি আমি এখন বুঝেছি গো। ছোটবেলায় লুকোচুরি খেলতাম তোমার সঙ্গে। তুমি পুলিশ হতে, আর আমি চোর। আমাকে সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে, তারপর শেষবেলা পেতে। মনে আছে, ধরা পরলে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতাম 'আমি তিন্নি নই, তিন্নি নই, তিন্নি নই, অন্য একজন। সেই শুনে তুমি আরও, আরোও আষ্টেপৃষ্ঠে কাছে টেনে নিতে। উফ কি ভীষণ জোর ছিল তোমার গায়ে, ঠিক ওদের মতো। তবে ওরা, যারা আমাকে সেদিন... উফ্ তাদের শরীরটা যেন লোহা দিয়ে তৈরি। উফ কী ভয়ংকর! যন্ত্রমানব। তোমার থেকেও শক্তি বেশি তাদের। ওদের মুখগুলো যদিও আমার মনে নেই, তবে মনে আছে ওরা সবাই কি যেন একটা লাল নীল মুখোশ পড়েছিল। জানো আমি এত কম আলোতেও সেদিন দেখতে পেয়েছি ওই জোকারের কদর্য, বিচ্ছিরি মুখোশগুলো থেকে রক্ত গড়াচ্ছিল আর লালা মুছছিল ওরা বারবার।

কৌস্তভের সঙ্গেই সেদিন দেখা করতে গেছিলাম গড়ের মাঠে। ওর সঙ্গে আমার ফেসবুকে আলাপ। ও আমাকে মেসেজ করল, একবার দেখেই নাকি ও আমার প্রেমে পড়ে গেছে। মাত্র একবারই ওকে মিট করেছিলাম পার্কস্ট্রীটের একটা রেস্টুরেন্টে। জানো, আমি চাইনিজ খেতে ভালোবাসি বলে ও সেদিন গুচ্ছের খাবার খাওয়ালো, তারপর বলল, আমাকে নিয়ে ও নাইট ক্লাবে যাবে। আমিও চলে গেলাম ওর সঙ্গে। কেন জানিনা, ওকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ করতে তখন আমার ভীষণ ভালো লাগছিল। জীবনে সেই প্রথম আমি কারোর হাত ধরে নাইট ক্লাবে গেলাম। সেখানেও কিসব হিজিবিজি খেলাম। মাথাটা টলমল করছিল বলে, ও আমাকে ওর গাড়ি করে সেদিন বাড়ি পৌঁছে দিল। বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে বকুনি আর দাদার কাছে কানমোলা খেতে হল। বৌদি এটা সেটা বলে বিস্তর অপমান করল। সেদিন ওদের সবার ওপর রাগ করে ঘরেতে ঘুমোইনি, ছাদের উপর শুয়েছিলাম। আশ্চর্য্য! বাবা সেদিন থেকে একদিনও কিন্তু তুমি আমাকে দেখা দাও নি। অভিমান করেছিলে বাবা, না গো? নাকি আমি বাজে মেয়ে বলে আমকে দেখা দাওনি? বল বাবা, বল–

সেদিনই রাতে নিজের মনে নিজে বারবার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কখনও কৌস্তভকে মিট করব না। ওই তো যত নষ্টের গোড়া! সামনেই ছিল আমার আই সি এস সি পরীক্ষা, মনোনীতা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, ও আমাকে বোঝালো যে এভাবেই নাকি বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ডেট করতে হয়, প্রেম করতে হয়। আমি কনভিন্সড হলাম। কৌস্তভকে কথা দিলাম, আবার মিট করব। সেদিন ভিক্টোরিয়ায় আমার সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। ও একটা দুধসাদা গাড়িতে আমাকে পাশে বসালো। তখন লক্ষ্য করিনি, পরে লক্ষ্য করলাম পেছনের সিটে আরও তিনজন ছেলে বসে আছে। কৌস্তভ বলল, ওরা নাকি ওর খুব বন্ধু। তারপর কি যেন ড্রিংক ও হাতে করে এগিয়ে দিল, আমি খেলাম, তারপর... তারপর আর কিছু মনে নেই। একটু একটু যা মনে পড়ছে তা হল জোকার, মুখোশ, সাদা ধবধবে বিছানা, টিম টিমে আলো আর রক্ত... রক্ত... লাল রক্ত... যন্ত্রণা... সারা শরীরে অসহ্য

যন্ত্রণা...

গতকাল তোমাকে খুব মনে মনে ডেকেছিলাম। তুমি এসেছিল স্বপ্নে, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, চল। তারপর ওই গানটা গুনগুন করছিলে... ‘আয় খুকু আয়... আয় খুকু আয়’... ঠিক ছোটবেলার মতো। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। তারপর হঠাৎ আমার হাতটা ধরে বললে, চল।

– কোথায় যাব, বাবা, কোথায় বল? জিজ্ঞেস করলাম

তুমি কোন উত্তর দিলে না। আমি গাইছিলাম, ‘ছেলেবেলার দিন ফেলে এসে সবাই আমার মতো বড় হয়ে যায় / জানিনা কজনে আমার মতো। মিষ্টি সে পিছু ডাক শুনতে যে পায়’... আবার বললাম, কোথায় যাব, বল? তুমি আবারও চুপ। কেন, কেন বাবা, কেন? আমি কি অশুচি হয়ে গেছি? তোমাদের বোঝা হয়ে গেছি, তাই? তুমি আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

জানো বাবা, আজকাল সারা শরীরে বড্ড যন্ত্রণা হয়। বুঝতে পারি, কোমর থেকে নীচের দিকটা কেমন যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বিছানা থেকে ও আর নিজে নিজে উঠতে পারি না। কতদিন হয়ে গেল... একমাস নাকি আরও কতদিন? একদিন ঘুমের ঘোরে শুনেছিলাম দাদাকে ডাক্তারবাবু বলছে, আমার জরায়ু নেই। আর পাকস্থলীটা নাকি ভয়ংকর ভাবে ড্যামেজড।

আমি এসব মোটে শুনতে চাইল। আমি বাঁচতে চাই ডাক্তার বাবু। আমি বাঁচতে চাই। আমি জানি, ওরা আমাকে ছিঁড়েখুড়ে একসা করে দিয়েছে। ছেলেবেলায় আমার দাদা একবার আমার খেলার পুতুলটাকে হাতে নিয়ে ঠিক এভাবেই...

আহ্ আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ছেলেরা কি এমনই হয়? তারা কি ভালবাসতে জানে না? ডাক্তারবাবু আমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না, শুধু একটাই কথার জবাব দিন, আমি কি আর কোন দিন ভালো হব না? আমার স্কুল, হোমটাস্ক, মনোনীতা, মা, আমার ফুটফুটে ভাইপো-ভাইঝি – রিও রিমা... ওদেরকে কি কোনদিন আমি দেখতে পাবো না? আমাকে কি সব ছেড়ে বাবার মতো চলে যেতে হবে? মানে, মরে যাব? নাহ্ নাহ্ ডাক্তারবাবু পায়ে পড়ি আমাকে ভালো করে দিন। আমি কৌস্তভকে দেখব, ওকে কি সুন্দর হ্যান্ডসাম দেখতে! রণবীর কাপুরের মতো চেহারা!

বাবা, আবার তুমি এসেছ? ডাকছ? না বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব না। না বাবা আমি জানি তুমি মরে গেছ কিন্তু আমি যে বাঁচতে চাই। যন্ত্রণাহীন সুস্থ মানুষের মতো হেঁটে চলে বেড়াতে চাই। আমার যে অনেক কাজ বাকি আছে বাবা। আমার আই সি এস সি পরীক্ষাটা দেওয়া হল না। আমি পরীক্ষাটা দেব ডাক্তারবাবু। আর কখখনো পড়ায় ফাঁকি দেব না বিশ্বাস করুন।

বাবা, ও বাবা, আমি যাব না তোমার সঙ্গে। আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে। বাবা আমার হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? কৌস্তভ, তুমি কিছু বলছ না? মা, ওমা তুমি কোথায়? ডাক্তারবাবু? আমি যাব না বাবা, যাব না। আমি বাঁচতে চাই – আমি বাঁচতে চাই। আমি বাঁচতে চাই।

ভোটঘোট

সৌরভ হোসেন

'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' কথাটা আমরা সবাই জানি। শুধু জানি না, এর ধক, স্বাদ, ঝাঁঝ আমাদের অনেকেরই পরখ করা। এবার গ্রামগঞ্জে কথাটা বেশি বেশি কানে ঠেকছে। বাতাসে উড়ছেও বেশি। তার কারণ, বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েত ভোটে বিজয় হাশিল। ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হল না, দেওয়াল লিখতে হল না, গাড়ি গাড়ি টাকা খরচ করে মিটিং মিছিল করতে হল না, অথচ খুব সহজেই হাতে মওয়া চলে এল! পেয়ে গেলেন পঞ্চায়েত মোড়লের আসন! পঞ্চায়েতে ছড়ি ঘোরানোর ক্ষমতা! আর এখানেই সব চেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয় নবনির্বাচিত (নবমনোনীত) পঞ্চায়েত প্রধান বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা জেলাপরিষদের সভাধিপতি বা কর্মাধ্যক্ষদের। উন্নয়নের কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কিম্বা নিজের দলের ভিতকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে। তার চেয়েও বেশি চ্যালেঞ্জ, প্রকৃত জনসমর্থন আদৌ আছে কি না তা যাচাই করা। একথা ঠিক, তাঁরা আইনি বলে 'পঞ্চায়েত মেম্বার'। মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট তাঁদেরকে সেই আইনি রক্ষাকবজ দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের কোর্টে তাঁরা তো যাননি? মানুষ হয়ত বা তাঁদেরকেই নির্বাচিত করতেন, কিন্তু তাহলেও তাঁরা ব্যালটের মুখো তো হননি? সুতরাং কোথাও এতটুকু হলেও মানুষের কাছে দায়বদ্ধতার খামতি কি থেকে গেল না? মানুষের 'কৈফৎ'এর উত্তর কে দেবেন? কোন পঞ্চায়েত সদস্য গ্রামের বা এলাকার কাজ না করলে, গ্রামের মানুষের কাছে একটা কথা প্রায় শোনা যায়, 'আসতেবার ভোট আসতে দে, মুখে ঝাঁটা দেব'। অর্থাৎ নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি তাঁর নির্বাচনী এলাকার কাজ না করলে, তাঁর ভোটাররা পরেরবার তাঁকে ভোট না দেওয়ার হুমকি দিতেন। অর্থাৎ তাদের কাছে পাঁচ বছর পর হলেও 'রি-কল'এর একটা সুযোগ থাকত। মুখের ওপর 'না' হলেও ব্যালটে 'না' বলার একটা ফুরসত থাকত। কিন্তু সেসব তো আর এখন থেকে খাটবে না। কারণ, এভাবে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার 'ট্রেন্ড' শুরু হয়ে গেলে তো ভবিষ্যতে আর ব্যালটের ভোট হবেই না! যেইই ক্ষমতাই আসবেন সেইই এই 'উন্নয়ন পথে দাঁড়িয়ে থাকা' বল প্রয়োগ করে সিংহাসন দখল করবেন। ফলে, পঞ্চায়েত সদস্যদের আর ভোটারদের দোরে দোরে গিয়ে কাজ না করার 'কৈফৎ' দিতে হবে না। দলকে গুচ্ছের উপঢৌকন দিলেই, পঞ্চায়েতের টিকিট পাক্কা। ফলে উন্নয়নের কাজের বেলায় লবডঙ্কা হলেও, মোড়লের আসন পাকাপাকি নিজের। কেউ এতটুকু নড়নচড়ন করতে পারবে না। এভাবে 'মোড়লের আসন' পেলে তার স্বাদ বেশি সুস্বাদু আরও মিঠে। তার মজাই আলাদা। ভোটের ক্যালেন্ডারে এই মিঠে স্বাদের ব্যাপারটা আজ নতুন নয়। এভাবে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার ধারা বামযুগেও ছিল রমরমিয়ে। 'বুথদখল' আর 'রিগিং' শব্দদুটো তো তখন আমাদের কানে কানে বাজত। সুতরাং আজ যাঁরা এসবের বিরুদ্ধে রাজপথে বিষোদগার উগরে দিচ্ছেন, চারা তো তাঁরাই পুঁতেছিলেন আজ ভুলে গেলে তো চলবে না? বিনাযুদ্ধে

সিংহাসন দখল করার রোগ চিরদিনের। ভয়, এ রোগ যেন ব্যাধি না হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে গণতন্ত্রের 'ইন্তেকাল' হতে আর দেরি থাকবে না!

বিরোধীরা অভিযোগ করছেন, এবার নাকি টাকা দিয়ে টাকা তোলার বছর। অর্থাৎ সবটাই নাকি টাকার লেনদেন। উপর থেকে নীচ, আমলা থেকে পুলিশ সবাই নাকি এর ভাগীদার! এই যে এত মানুষের মধ্যে হুট করে একজন সরকারি দলের 'পঞ্চায়েত নমিনি' হলেন বা 'মনোনীত সদস্য' হলেন, সেটাও কি জলের মতো সহজ সরল ভাবে ঠিক হয়ে গেল! সাধারণ মানুষের মনে তো খটকা থেকেই যায়! কোথাও কি এতটুকুও কিন্তু কিন্তু নেই? কে বা কারা এটা ঠিক করলেন, কীসের ভিত্তিতে ঠিক করলেন, মাপকাঠি কী ছিল, সবই তো ধোঁয়াশা না? এসবের নেপথ্যে কোন কলকাঠি কাজ করেছে? কোন মন্ত্রে এসব ফলল? সবই কিন্তু সাধারণ ভোটারদের মুখে মুখে ফিরছে। চায়ের দোকান, ফুটপাথ অথবা খেতখামারে কাজের সময় এ চর্চা অব্যাহত। মানুষ তার মনের খাতায় সে হিসেবনিকেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। উত্তর নোট অথবা ঘোট যেকোন একটা অথবা দুটোই হতে পারে। অনেকেই বলছেন, প্রার্থী হতেও নোট লেগেছে আবার 'মোড়লের আসন'টা পেতেও নোট লেগেছে। ফলে 'আসন' পেয়ে 'নবনিযুক্ত মোড়ল'দের প্রথমেই টার্গেট থাকবে এই কারবারে(!) তিনি যে টাকা পুঁজি হিসেবে লাগিয়েছিলেন সেগুলোকে সুদে-আসলে তুলে নেওয়া। কারণ তাঁদের তো মানুষের কথা ভাবার বিষয়ই থাকবে না। কারণ, তাঁরা যেহেতু মানুষের ভোটে নির্বাচিত হননি, ফলে মানুষের কাছে 'কাজ না হওয়ার ফিরিস্তি' দেওয়ার কোন ব্যাপারই থাকবে না। ফলে এলাকার উন্নয়নের হাল হবে তথৈবচ! প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে যাবে উন্নয়ন। মাটি কাদায় না ফলে তখন উন্নয়ন গায়ে মাখবে আর মুখে ফলবে। সুতরাং নবনিযুক্ত 'পঞ্চায়েত মোড়ল'দের কাছে এটাও একটা চ্যালিঞ্জিং সময়। তাঁদেরকে সব রটনাকে উন্নয়ন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, তবেই তাঁরা সত্যিকারের 'গাঁয়ের মোড়ল' হতে পারবেন। মানুষের আপদে বিপদে থাকার 'নেতা' হতে পারবেন। মনে রাখতে হবে 'রটনা' যেন 'ঘটনা' না হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ কিন্তু সবসময় সজাগ। ধরাকে সরাজ্ঞান করার ভুল যেন না হয়। দেওয়ালের যেমন কান আছে, ঠিক তেমনি পথেরও চোখ আছে। সে পথ খেটেখাওয়া মানুষের, মজুরের কৃষকের, গণতন্ত্রের মুল শক্তি সাধারণ ভোটারের।

গ্রাম বাংলার মানুষের কিন্তু আরেকটা দিকে তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে। এর আগে আমরা প্রায় বিরোধী পঞ্চায়েতগুলোর কাছ থেকে একটা অভিযোগ শুনতে পেতাম, বলতে গেলে শুনে শুনে আমাদের কান ভোঁতা হয়ে গেছে, সেটা হল, সরকারের বঞ্চনার অভিযোগ। তারা প্রায় অভিযোগ করতেন যে আমরা রাজ্যসরকারের বিরোধী হওয়াই রাজ্যসরকার আমাদেরকে বিভিন্ন উন্নয়নের টাকা আটকে দিচ্ছে। বিভিন্ন খাতে টাকা দিচ্ছে না। সেসব অভিযোগ কিন্তু এবার আর ধোপে টিকবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা পরিষদ এখন সরকারি দলের দখলে। ফলে উন্নয়নের বরাদ্দ টাকা কোথাও বিন্দুমাত্র আটকানোর কথা না। 'থ্রু প্রপার চ্যানেল'এর মতো টাকা চলে আসার কথা। সাধারণ মানুষ এবার মুখের ওপর বলতে পারবেন, 'কী গ কাজ আটকে কেন? এখন তো সব জায়গাতেই তোমরা। 'ফলে সেক্ষেত্রেও নবনিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। মানুষের কাছে 'কেন উন্নয়ন হয়নি' বলার আর কোনও যুক্তি থাকছে না। যদিও কেন্দ্রের বঞ্চনার

ঢাক ঢোল বাজতেই থাকবে। কারণ সেটাই রাজনীতি। একজন আরেকজনকে ঠুকে দেওয়ার রাজনীতি। সেটা কখনও ঢাল কখনও তলোয়ার। আবার কখনও দাবিদাওয়া আদায়ের কলকব্জা।

প্রায় বিরোধীহীন পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রায় সব নেতাই সরকারি দলে নাম লিখিয়েছেন বা লেখাচ্ছেন। যাঁরা এদিক ওদিক এটুআধটু বেঁকেবুকে আছেন, তাঁরাও নাম লেখানোর জন্যে 'লাইনে' আছেন। ফলে যাঁরা এই 'পঞ্চায়েত মোড়ল'এর ক্ষমতার আসনে বসছেন, তাঁরা কিন্তু সবাই আদি তৃণমূল নন। অনেকেই অন্য দল থেকে এসেছেন। যাঁদের অনেকেই আবার বাম সরকারের সময় বামপন্থী ছিলেন। ফলে ক্ষমতার মধু খাওয়ার অভ্যাস কিন্তু তাঁদের শরীরে রয়েই গেছে। সে 'অভ্যাস' যেন এবার 'ব্যাধি' না হয়ে দাঁড়ায়! পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কাদাজলে নেমে, মানুষের আপদে বিপদে ছুটে গিয়ে সহমর্মী হয়ে, রাতদিন এক করে বাংলার উন্নয়ন করতে চায়ছেন, সেকাজকে কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের কোমরে গামছা বেঁধে নামতে হবে। সবসময় মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে হবে। তবেই গ্রামীণ বাংলায় সবুজ ফলবে। উন্নয়নের সুফল পাবেন পিছিয়ে পড়া মানুষ। আর সে কাজের প্রধান সৈনিক কিন্তু এই পঞ্চায়েত সদস্যরা। কারণ এঁরাই সবসময় চব্বিশঘণ্টা একেবারে সমাজের তৃণমূলস্তরের মানুষের সাতেপাচে থাকেন। উঠতে বসতে, ঘুরতে ফিরতে মানুষের চোখে চোখে থাকেন। একজন সাংসদ বা বিধায়ক তাঁর নির্বাচনী এলাকায় কমই যান। অনেকে এঁদের সম্বন্ধে অভিযোগ করেন যে ভোটের সময় ঘুরঘুর করলেও, ভোটে জিতেই পগারপাড়। আপদে বিপদে তাঁদের টিকিও দেখা যায় না। কিন্তু সে অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যদের ক্ষেত্রে নেই। সে অভিযোগ ধোপে টিকবেও না। তাঁরা কিন্তু নিজের এলাকাতেই থাকেন। হয় গ্রামে নতুবা গ্রাম ঘেঁষা বাজারে। ফলে মানুষের সাথে মানুষের পাশে থেকে কাজ করার পরিসর কিন্তু অনেক। আর তাঁরা যদি সত্যিকারের হাঁটু গুটিয়ে উন্নয়নের কাজে নেমে পড়েন, তাহলে গ্রামবাংলার উন্নয়ন হবেই। আর গ্রামের উঠোনে উন্নয়নের ফসল ফললে, তার হাওয়া লাগবে শহরেও। তখন সত্যিই পশ্চিমবঙ্গ হাসবে। কিন্তু ফাইলে ফাইলে যেভাবে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে, কমিশন খেতে খেতে উন্নয়নের বরাদ্দ যেভাবে নিচু স্তরে এসে কানাকড়িতে ঠেকছে, তাতে চোখ কান খোলা রেখে খেয়াল রাখতে হবে, যেন বাস্তবে না হয়ে খাতা কলমেই পুকুর কাটা না হয়ে যায়। উন্নয়নের টাকা যেন ফাইলে বন্দি হয়ে ফাইল হয়ে ফিরে না যায়। আমরা প্রায় শুনতে পাই, পরিকল্পনার অভাবে উন্নয়নের কোটি কোটি টাকা ফেরত গেল! পঞ্চায়েত সদস্যদের এই আত্মঘাতী পথকে বন্ধ করতে হবে। পঞ্চায়েত সদস্যরা যেন 'টাকার ভাগীদার' না হন। তাঁরা যেন সত্যিকারের 'উন্নয়নের চৌকিদার' হন। মনে রাখতে হবে, মানুষ কিন্তু তাঁদেরকেই সবচেয়ে কাছ থেকে জরিপ করেন। আবার এটাও মনে রাখতে হবে, দলবদলের নেতারা কিন্তু কখনই পরিবর্তন আনতে পারেন না, পরিবর্তন আনেন সাধারণ মানুষ। সেদিকটা অবহেলা করলেই কিন্তু মারাত্বক ভুল হয়ে যাবে। ইতিহাস সেকথাই বলে। ইতিহাসের সে ভ্রূকুটি অবগ্যা করলেই কিন্তু মারাত্বক বিপদ!

সন্ন্যাসিনীর সংসার সমর

সুপ্রীতি বর্মন

সন্ন্যাসিনীর সংসার সমরে অলীকপৃষ্ঠা জুড়ে শুধু ভ্রান্তি। কাল্পনিক ষোলোকলা চারুলতার হর্ষপ্রাপ্তি কেবল বিচক্ষণতার সৃষ্টিশীল কায়াপলটে। আজ সঙ্গতিহীন কদর্য অমাবস্যায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা কুমারী রোদ্দুর সিনড্রেলা হয়ে উঠেছে, অসংলগ্ন সামর্থ্য বলিরেখার ব্যায়ভার ডিঙিয়ে। তবুও তার ব্যতিক্রমী পদ্মাক্ষরে ভাদুরে প্রণয়ালাপ অনেকটা নিমন্ত্রণ দিয়ে যায় মন্দভাগ্যের কটুক্তির ন্যাকা বোকা সংলাপ। এফোঁড় ওফোঁড় অট্টহাসির উপহাসে ছেঁড়া কাঁথায় কখন অপ্রতিরোধ্য প্রজ্ঞা সূঁচের টানে ফুটতে লেগেছে ব্যতিক্রমী জরায়ু জাত কুসুম, এক অলীক কামফুল, নাভি হিরন্ময়ী চারু চন্দ্রকলা, কে তুমি...

যখন জাপটে ধরেছে ঊরু কন্যাকুমারীর নিলর্জ্জ অর্থক্ষোভ, সর্বস্বান্ত উলঙ্গ দিনের আশায় মধ্যবিত্তে করেছে শিকড়ের শাখা প্রশাখার আলিঙ্গনে প্রলম্বিত ফাটলের কোন পরিত্যক্ত হানাবাড়ি। ঠিক তখনি অস্তিত্বের খোলস ভেঙে আত্মরতি নিমগ্ন হয় স্পর্ধার সম্প্রসারণে। তার অভুক্ত বর্ণমালায় ঘুঙুরের ধ্রুপদী নৃত্যে ময়ূরকণ্ঠীর শুভ পরিণয়ের রাজযোটক এঁকে দিতে জোড়া ভ্রুর কাজলাদীঘির যুগ্মসন্ধিক্ষণে ক্লান্ত অবসাদের চরা কে ডুবিয়ে দিতে। তারপর অরণ্যে একদিন শঙ্খলাগা সর্পযুগল আড়িমারি ঠেস ভেঙে গোগ্রাসে গিলে নিতে থাকে সকল পরিত্যক্ত যাপনচিত্রের খোলসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রণয়বিষ। আর উগরাতে থাকে সৃজনী শক্তির ছলাকলা (সৃজনশীলতা)। এক উলঙ্গ বীর্যপাতে চুঁইয়ে আসা নির্ভেজাল প্রেমের রাজকীয় চিত্রনাট্য, এখানে সব চরিত্র কাল্পনিক।

নস্টালজিক অফবিট কালারস সেলুলয়েডে পরিণীতার ভারী জরোয়া বেনারসীর লজ্জাবস্ত্রে ক্লান্তির কালঘাম শুষে প্রণয়িনীর ঊরুযুগলের চৌকাঠে প্রেমিক তোমার নিষিক্ত চুম্বন দাগ অবশিষ্ট আছে। অন্ধ সমাজে আজও প্রতীয়মান তাই আমিই শ্রেষ্ঠা। আলুথালু অবিন্যস্ত কেশে একাকীত্বের কালচে প্রণয়ের অধঃক্ষেপ। আঁচলের তলায় তিলের একরত্তি কুসুমে নজরলাগার দোষ কাটানো প্রেমিক ক্ষুধার পরাগরেণুর সঞ্চয়ে তুমি শুধু এখনো আমারই আছো। দেখো আমার প্রেমিক কেমন স্তনপোষ্য দুগ্ধে মুখ গুঁজে অতীন্দ্রিয় প্রহরায় দিন গুনতে লেগেছে কবে আমি শুধু তার হবো...

সার্বজনীন প্লাটফর্মে সাজসজ্জায় জবুথুবু কাষ্ঠলৌকিকতার বজ্রবিদ্যুৎ হাসির নিনাদে থ্যাঁতলানো হয়ে যায় অগোচরে বিষাদের গ্রহণে পর্যুদস্ত ভাঙা চাঁদ। তার জ্যোৎস্নায় কৃত্রিমতার গুঁড়ো কখন বিভীষিকাময় করে তোলে নিয়ন আলোয় উর্বশীর নৃত্য যে তার ওষ্ঠাগত হাপর টানা নিঃশ্বাস লুকিয়ে যায় গ্লাসে ঢালা আকণ্ঠ পিপাসিত মদের হ্রদে।

আগাছার গোত্রনির্ণয় অবাঞ্ছিত তার পৃথকীকরণ তাই তেলে জলে খাপ না খেলেও অনেকসময় সহবস্থানের বাধ্যবাধকতার জটিল সমীকরণের সমাধান অপর্যাপ্ত হয়ে অস্বস্তি ফেলে যায় তোমার কপালের ভাঁজে, যেন একটা প্রশ্নবোধক যতি এমনটা কি হওয়া সত্যিই খুব সমীচীন ছিল বোধহয় না। আসলে সবটাই কোন অলস ভোরের না দেখতে চাওয়া অবাঞ্ছিত কুয়াশার ঊর্ণনাভ জাল, এক অন্ধভ্রমর।। এক আত্মসমর।।
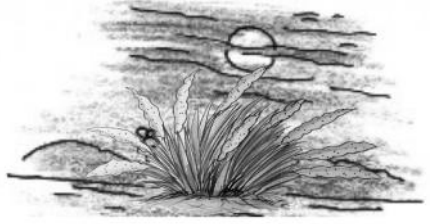
শ্যামল বন্দোপাধ্যায়ের ছড়া

(১)

একটা শিশু ইটের ভাটায়
একটা শিশু লন্ডনে
একটা শিশু মাঠে-ঘাটে
একটা শিশু গোচারণে।

(২)

মৌটুসি রে মৌটুসী
ফুলের উপর দাঁড়িয়ে আছিস
মধু খাচ্ছিস ফুলটুসি
কিচিরমিচির ঝাপটে ডানা
কি সুন্দর খুনসুটি খুনসুটি।

(৩)

এতো গান আছে, এতো প্রাণ আছে
আছে কত কথা
সবকিছু যেও ভুলে
সহে যে, যত কিছু ব্যথা।

(৪)

সতেরোটি চিল দেখতে পেলাম বেঙ্গালুরুর
যশবন্তপুরম জংশন স্টেশনের আকাশে
আমার বাংলার আকাশে কোথায় চিল ?
জানতে গেলেই মুখটা হবে ফ্যাকাশে।

শরৎ বলে জানি

সোহেল রানা

বর্ষামেয়ের দুঃখ মুছে
শুভ্র মেঘের ভেলা
নীল আকাশে স্বাধীন হয়ে
করতে থাকে খেলা।

শস্য ফুলের শোভা এবং
মিষ্টি রোদের আলো
পাখপাখালির কলরবে
মন হয়ে যায় ভালো।

নদীর তীরে কাশফুলে দেয়
কখনও হাতছানি-
কোন ঋতুতে ? আমরা তাকে
শরৎ বলে জানি।

একটু অন্তরাল

পলাশ ব্যানার্জী

ছাতার তলে ফিসফিসিয়ে
এক চিলতে হাসি
বলতে চাওয়া গায়ে বসে
অনেক ভালোবাসি।

মেঘলা আকাশ গুর গুরিয়ে
বৃষ্টি নামে ঐ
দূরে সবাই আরোও দূরে
এক কাছেতে রই।

বৃষ্টি আসে বৃষ্টি যায়
আকাশ ঢাকে রোদ
চিলতে হাসির মাঝেও কোথা
ঝগড়া শোধ বোধ।

কেউ বা হাসে কেউ বা কাঁদে
কে - ই বা খোঁজ রাখে
ছাতার তলে গল্প কথা
এভাবেই মুখ ঢাকে।

কোথাও বা ঠোঁট - ভিজিয়ে দিয়ে
কোনো গাছের ফাঁকে
জীবন হেথা বাঁচতে চেয়ে
নতুন সূর্য আঁকে।

রেলগাড়ি

নুরুল ইসলাম মিয়া

ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ছুটে রেলগাড়ি
খালবিল পার হয়ে দেয় দুর পাড়ি।
সাদাকালো ছোট বড়ো জাতিভেদ ভুলে
যারা যেথা যেতে চায় নিয়ে যায় তুলে।
যেই থামে ওঠে নামে কত লোক ভাই
দিন রাত ছুটে চলে অলসতা নয়।
কেউ সিটে কেউ নীচে সেথা নেয় ঠাঁই
জানালার ধারে যেতে কচি মন চায়।
পাবে সেটা ঝাল মুড়ি কফি চা বাদাম
আরো পাবে কলা শসা লিচু পাকা আম।
মনোহারি মনোহারা আরো কত শত
নিতে পারো খেতে পারো নিজ রুচি মত।

অপরের বোঝা নিয়ে ছুটে রেলগাড়ি
কোনদিন কারো সাথে নেয় তার আড়ি।
হাসিমুখে সেবা দিয়ে চলে অবিরত
জীবনে চলার পথে সেবা তার ব্রত।
সেবা বড়ো, সেবা মাঝে নাই কোনো লাজ
রেলগাড়ি করে তাই এই বড়ো কাজ।

সোনার ছেলে

মোঃ আনিকুল ইসলাম

খোকন সোনা চাঁদের কণা
ভীষণ ভাল ছেলে
আদর করে সবাই তাকে
সোনার ছেলে বলে।
সুস্থ মনের শান্ত ছেলে
ঝগড়া জানে না
মিথ্যা কথা মন্দ কথা
বলতে পারে না।
পিতা-মাতা গুরুজনের
সদাই সেবা করে
খেলা পড়ার সাথির সাথে
থাকে হৃদয় জুড়ে।
পড়ার সময় পড়া করে
খেলার সময় খেলা।
সবার সাথে মিলে মিশে
থাকে সারা বেলা।
শতক গুনের খোকন সোনা
বুদ্ধি করে চলে
তাইতো সবাই আদর করে
সোনার ছেলে বলে।

জলের মাছ

দীননাথ মণ্ডল

কাদার ভেতর হাপুস হুপুস
করছে কে কে ?
শিঙ্গি মাগুর ট্যাংরা বোয়াল
শোল মাছটা যে।
রক্ত নাই তার নরম দেহে
কে করছে খেলা ?
শুং উচিয়ে বেড়ায় ছুটে
চিংড়িটা দুবেলা।
তিড়িংবিড়িং নাচছে জলে
ওগুলো কি কি ?
খয়রা পুটি চ্যাঙের ছা
আর হল ডারকি।
খুঁজছে কারা মায়ের মুখে
নিজের আশ্রয় ?
তেলাপিয়ার ছোট্ট পোয়ান
দারুণ তাদের ভয়।
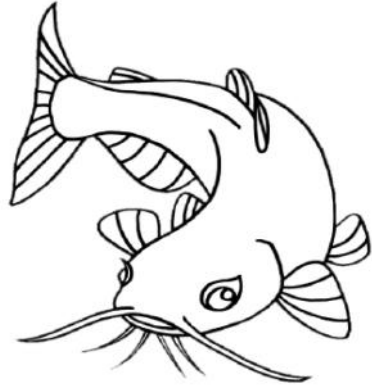
বহতা হও

হামিদা কাজী

তুমি তো তোমার মতো ছিলে।
জ্বালা ছিল আমার বুকে,
ভিসুভিয়াস!

কে দেয় যন্ত্রণা
কাকে ?
মানুষ ধূপের মতো
আপন-ই জ্বলতে থাকে।

কেবলি দোষারোপ
উঠোন জুড়ে
যেমন বনাঞ্চল
নদীর তীরে
অগ্নি শিখা নয়,
বহতা হও,
তুমি-ই শিখিয়ে দিলে !

যেসব স্বাভাবিক

শ্রীজাতা কংসবণিক

গভীর রাতের দেওয়া গুঢ় প্রতিশ্রুতি
তারা হয়ে গেছে
যেমন মানুষ যায় রূপকথা ফুলের বাগানে!
গভীর রাতের বলা পুরনো কথারা
বিশেষত স্মৃতিদের ভিড়ে
মিলেমিশে, একপাতে খেয়ে
শীতঘুমে চলে গেছে, চিরহিম মনের ভেতর

এখানে কিছুই নেই, যাকে বলা যায় ঘুম
ঘুমের ভেতর কোনও অদেখা অস্থির দৃশ্য
কিছু নেই,
শুধু জেগে দেখি স্থির জলে মাছ
বেঁচে আছে যেন, বাঁচার তাগিদে।

হয়তো হয় না কিছু...
এসব সরল ক্ষয়, রোজ রোজ ঘটে যায়

ঘুমন্ত শরীরে
নিঃস্ব হয়ে যাই, রোজ,
অদৃশ্যে থাকে না আর কেউ।

দেখা হোক

অলক্তিকা চক্রবর্তী

সুরভিত চন্দনের বনে তবে আলোছায়া খেলুক...
স্বভাবে কাতর তবু সহজ নির্মিতি জুড়ে ফুটে ওঠা অনুচ্চার ছেলেবেলা
সারল্য দিনগুলো গুণে গুণে উঠে আসুক খোলা সামিয়ানায়
একান্তের মাঠ ঘাট পেরিয়ে যাওয়া হাওয়ায়
মুক্তির রশদ জোগাক হৃদকমলের ধুন...
সোহাগী বর্ণনা বিলাস জুড়ে খেলা করা সেই সব অমৃত আখর
একটা একটা তুলে নিয়ে
জাতকের গল্প বলুক রোদছায়া বেলা
আমার একান্ত আকাশ ব্যাপ্ত দিগন্তরেখা জুড়ে আড়বাঁশি বাজুক
ভেঙে পড়া তুচ্ছাতিতুচ্ছ সবটুকু নিয়ে
ঢেলে সাজাক ভালোবাসা দিন আদরে আদরে
দেখা হোক... নিয়তি...দেখা হোক...

না-থাকা

নাসিম এ আলম

তোমার না থাকাটুকু সযত্নে আগলে রেখেছি
মাটির ঘর, ওই ধরা জানলা নিঃস্বতার শ্বাস প্রশ্বাস
পিতৃ পিতামহের কার্যের সিন্দুক ঝাড়বাতির রোশনাই
অপ্রয়োজনীয় মনে হয় আজ, তবুও ছুঁয়ে দেখা
তোমার না থাকাটুকু
ছুঁয়ে দেখা
প্রতিটি পথের মোড়ে সঙ্গহীন একা গাছ
ছুঁয়ে দেখা শব্দেরা কোন কথা বলে না আজ
শুধু দুপুরের নিঃস্বতায় ধুলো পড়ে
অব্যবহৃত হারমোনিয়ামে ধুলো পড়ে
দুপুরে একফালি নীলে, যখন কোথাও কেউ নেই

বোবা রাত্রির স্বপ্ন ভেঙে যায়
কৌশিক বড়াল

আকাশপটে হাসিমুখ
গোল চাঁদ। এলোপাথারি কথার মাঝে জীবন গল্পগাথা

মোমশিখা ঘিরে উপচে পড়ে
অপার বিস্ময়। বোবা রাত্রির স্বপ্ন ভেঙে যায়।

সুঠাম অতীত
মাথা তোলে... বর্ণমালা ওড়াওড়ি করে

গাঢ় নীল মধুমাসে জেগে ওঠে
উদ্বাস্তু দুপুর। ছুঁয়ে যায় নিষাদ কোমল। নির্ভরতার
আলোয় কাঁপে গহন পাতার ঝোপ।

শব্দহীন নদী, মাঝে মাঝে ভাঙা পাড়... ঘাসের উপর
অপলক শুয়ে বিকেলের নীলখাম

প্রণয়ের স্তরে স্তরে সাজানো।
অজস্র নালিশ। প্রাচীন শয্যার কাছে নির্বাসিত আগুন

পাণ্ডুলিপির সাদা পাতা ঢেকে রাখে
সমস্ত উল্লাস। মাসোহারা উড়ে যায়... ভাদ্রনদী থই ভাসে

বর্ণহীন বিকেল আমাকে ভরিয়ে দেয় বিষন্নতায়

পদধ্বনি
আসাদ আলী

দিকে দিকে -
ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শুনি
ভয়ে ভয়ে শুধুই প্রহর গুনি
জমাট বাঁধে শুভ শক্তি যত
অশুভ যা করুক মাথা নত
এই প্রার্থনা এই রইল আশা
শুভ বুদ্ধির মানুষ আছে যত
তাদের জন্য রইল ভালোবাসা।

সার্কাস
মোজামমেল সেখ

সাকার্সের রিঙে - তুমি অনন্য খেলোয়ার
আমরা বেবুজ দর্শক!
তোমার দারুণ কেরামতি
হাততালিতে ফেটে পড়ে হল...
এক কোণে চুপ - উদাসী জোকার!

কোথাও দেখি না হৃদয়

তৈমুর খান

তোমার ভ্রমর কত দূর যায় ?
ডানার কম্পনে বসন্তের চিঠি
ঘুমঘোর স্বপ্নের উদয়

নির্বাসিত এইখানে ভাঙা সংসার
কচ্ছপের মতো দিন কাটে
নিজেরই গর্তের সীমানায় চেয়ে রই

সভ্যতার ইটগুলি একে একে খসে
ধ্বংসস্তূপ থেকে আলোর কন্যারা বেরিয়ে আসে
অসামান্য তাদের প্রতিভা —
প্রতিভা কি হৃদয় ধারণ করে ?

কোথাও দেখি না হৃদয়
সৈনিকের সতর্ক বাঁশি বাজে
লংমার্চ শুরু হয় যুদ্ধের মহড়ায়

অকাতরে সকাতরে

আশা ফিরদৌসী

কখনও কখনও নিথর
পাথরও কত ঢের কাতর
হয় অকাতরে।
তবুও সেই কাতর পাথর
কখনও কখনও নিথর
হয় সকাতরে।

রজঃ-বীর্য

আশিস গিরি

বিকেল ডুবলে ডুবুক অজয়ের জলে
নিজেকে জড়িয়ে রাখি অশ্বত্থ বাকলে।
কেঁদুলির ধুলো পদ্যে অনন্ত মিথুন
রজঃ- বীর্যে মজে যায় বাউলিয়া ধুন।

ঘন গাঢ় অন্ধকারে কৃষ্ণ-কবি একা
পুরুষ প্রকৃতি মিলে ভোগে ত্যাগে দেখা।
জগৎ ভাবলে ভাবুক ছায়া অংশ সার
ভাণ্ড জুড়ে ব্রহ্মান্ড খ্যাপা তুমুল সংসার।

মনেপ্রাণে কাম ও ধেনু, নাভিকুণ্ডে গান
রাইকিশোরী রক্তেমাংসে প্রেমাতুরা প্রাণ।
মুর্শিদে মোক্ষ গুরু রাসূল সংযোগ
জয়দেবে মজে আছে নিষ্কাম সম্ভোগ।

রাত্রির গান

আবু রাইহান

রমণীয় রাত্রির গান গেয়েছিল প্রিয় এক নারী
আমার সাথে ছিল তার নিবিড়তম পরিচয়
শরীরে জড়ানো ছিল কামনা রাঙানো শাড়ি
ওষ্ঠে গভীর চুম্বন এঁকে ভাঙ্গিয়ে ছিল ভয় !

মায়াবী রাত্রির মোহে পড়েছিলাম আমি বোকা
প্রত্যাখ্যানের চিহ্ন ললাটে ধরেছি স্থায়ি
কলঙ্কিনী চাঁদ তুমিই তো দিয়েছিলে টোকা
নিজেই ফেরালে মুখ আমাকে করলে দায়ি !

নিশীথের সেই নদী ছিল খাপ খোলা নগ্ন
শরীর জারিত জলে সাঁতারে থেকেছি মগ্ন !

হায় প্রিয় নদী কেন তোমার এই বিস্মৃতি
অতীতের জলজ ক্রীড়ার মায়াময় সব স্মৃতি!

সুন্দর

মুস্তাফিজ রহমান

একখণ্ড শীর্ণ শুভ্র মেঘেও এত বিদ্যুৎ
থাকতে পারে স্পষ্ট হল তোমাকে দেখেই

অথচ শান্ত হলেই
পুষ্পিত ইশারা চোখে
আগুনের দাহ নেই

মরণ, তোমায় সেলাম

দেবপ্রসাদ সরকার

প্রসাধিত করবার জন্যই
বিরতি বিশ্রাম।
যুগ হ'তে যুগান্তরের বুকে
জন্ম, মৃত্যুর যে পরিণাম,
নিরন্তর ক্রমাগতির যে উত্তম আবেগ
মৃত্যুতে কোন ছেদ নেই তার,-
মৃত্যু, মাত্র বিশ্রাম।
মৃত্যুহীন মরণ,
তোমায় তাই, সেলাম,- সেলাম।

স্বপ্ন

হাবিবা খাতুন

যদি তুমি আসতে,
আমার ভাঙা দরজার সামনে কোনো দিন,
তোমার চেনা জানা গল্পগুলো অতীত করে
নতুন স্বপ্নের জাল বুনতাম, একসাথে।
হয়তো মনের ঘরে আঁকতাম রংধনু
অন্তরে বাজতো নানান সুরে মাদল,
খোলা জানালা দিয়ে আসত মিষ্টি হাওয়া,
নতুন সুর নতুন তালে গাইতাম
জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা ছড়াত,
আমাদের জীবন নদীর
চঞ্চলতায় বয়ে যেত
আমাদের সুখ কাহিনী,
চার দেওয়ালে
মুগ্ধতায় ছড়াত বাতাস
দহন যন্ত্রণা ভুলে সুখের আল্পনা এঁকে...

ইচ্ছে দিন

সামিম আখতার খান

মেঘলা দুপর পেরিয়ে একলা বসে
ভাবতে ভাবতে উঁকি দেয় কোণে
কোনো একদিন তাকে ধরেছি জড়িয়ে
কবেকার অগোছালো দুপুরে
সেদিন উড়ু উড়ু মেঘের মতো
আগমনী বিকেলের ঘনঘটা
কারো মুখে কোনো কথা নেই
দুটি শরীর একে অপরকে মেপে নিচ্ছে
চোখে লজ্জার ছাপ স্পষ্ট
নিরুদ্দেশে হারিয়ে যাচ্ছে নানান প্রশ্ন
তারপর আলগোছে জড়িয়ে নিই সমস্ত আহ্লাদ
হাত রাখি শরীরে, শুষে নিই প্রবল উত্তাপ
মৌন অনুভবের শিকড় ছড়িয়ে পড়ে
তারপর শরীরজুড়ে শীতল শান্তি এভাবেই ডানা
মেলে আমাদের ইচ্ছে দিন।

গোধূলি বেলা

আব্দুল বারী

আমার মা নিরক্ষর নয়
আবার স্বাক্ষর ও।
অনেকটা যেন গোধূলি বেলা।

তা সেই মা সেদিন বললেন
আগুনেরও পাখা আছে।
আগুন উড়ে বনে বনান্তরে
দেশে দেশান্তরে- মনে মনান্তরে।

কোন আগুনের কথা বললেন মা?

মা তো জানেন না ইরাক - ইরান
সিরিয়া লিবিয়া - ইয়েমেন প্যালেস্টাইন
কিংবা আমরা ওরা বদলা বদলি
ইউ পি এ, এন ডি এ।

তবে অনেক গৃহযুদ্ধ দেখেছেন
দেখেছেন বিবর্ণ সময়।

অধিকার

নিবেদিতা নাগ মজুমদার

তুমি তো আমার নও, তাই হাত খুলে আকাশে উড়িয়ে দিই সব চাওয়া।
মেঘের মত তোমার বাড়িতে ছায়া দেয় সেই সব বোকা মেয়ের ভাবনা
আমার ডিম ভরা শ্যাওলার গোলা
ভেসে বেড়ায় নোনা জলের স্রোতে।
অচেনা মৎস্যখামার, পাখনা ছড়িয়ে দোলাতে দোলাতে উড়ে যায় জলের গভীরে
যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, তবু রঙিন হয়ে আছে প্রবালের পাহাড়।
সে রঙ তোমার
আমার জীবনে।

চলার পথে

রূপক চট্টোপাধ্যায়

সেই কবে মনে নেই - সভ্যতার ঊষালগ্নে
হাজার হাজার বছর ধরে - অনেক পথ পেরিয়ে
সভ্যতার পথে চলেছি - শুধু চলেছি।
নৌপর্যটক ভাস্কো-দা-গামা, ভূপর্যটক ফা-হিয়েন
কিংবা হিউয়েন সাঙ, আজ আমি বড় ক্লান্ত, অভুক্ত,
নেই আমার যশ, গৌরব, রূপ, লাবণ্য
তবু চলেছি; মার্কো পোলো, ইবন বতুতা
হিমালয় থেকে আল্পস আন্দিজ; গোবি থেকে সাহারা মালাহারি
পৌঁছেছি কুমেরু, সুমেরু, আমাজন প্রান্তে;
মেহেরগড়, হরপ্পা, আর্য, ব্যাবিলন, চীন সভ্যতা
হয়ে আমি হেঁটেছি, মমিময় মিশর, রোম
মায়া, আজ টেক, ইনফা, আজ মনে হয় -
সব শেষ হয়ে গেছে।
তবুও শুধুমাত্র 'আশা'র উপর ভর করে,
আজ আমি চলেছি, চিৎকার করে বলেছি;
সব কিছু নাও ! বেঁচে থাকুক,
মাতৃগর্ভ - জরায়ু; এ পৃথিবী, সবুজ ফসল।
কৃষকের লাঙল; থাকবে না এ দম্ভ,
একদিন শেষ হবে, কৃত্রিম সভ্যতা,
মুছে যাবে, দাম্ভিকতা -
তবুও আমি চলেছি; বুকভরা আশায়
পথে চলেছি, বলেছি, ধ্বংস নয় ! সৃষ্টি !

কনক একবার কান দাও তো

নির্ঝর চট্টোপাধ্যায়

কনক একবার কান দাও তো
আমার বুকের মধ্যে
দেখতো শব্দ কিসের বার্তা দেয়

তুমি মন দিয়ে শুনে
একবার বলো না
কারণ আমি শুনতে পাইনা
আমার বুকের শব্দ

তোমার কোন ভয় নেই
তুমি নির্ভয়ে বলো
আমার বুকের শব্দ কি বলতে চাই

জানো কনক আমার বুকের ভেতর
অনেক শব্দ লুকোনো আছে
যার মানে আমি খুঁজে পাইনা
তুমি বললে আমি খুশি হবো

কবি/লেখক পরিচিত

(বর্তমান বাসস্থান)

অর্ণব বড়াল, সাটুই, মুর্শিদাবাদ
অলক্তিকা চক্রবর্তী, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান
আমিনুর রাজ্জাক দফাদার, ধাপারিয়া, নদীয়া
আবু রাইহান, পূর্ব মেদিনীপুর
আব্দুল বারী, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ
আশা ফিরদৌসী, মীরচক, মালদা
আশিস গিরি, কলকাতা
আসাদ আলী, কলকাতা
কালাম শেখ, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ
কৌশিক বড়াল, সাটুই, মুর্শিদাবাদ
চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী, নদীয়া
তাপস মুখোপাধ্যায়, খড়গপুর, পূর্ব মেদিনীপুর
তৈমুর খান, বীরভূম
দীননাথ মণ্ডল, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ
দেবপ্রসাদ সরকার, বলরামপুর, মুর্শিদাবাদ
নরেশ মণ্ডল, কলকাতা
নাসিম এ আলম, সিউড়ি, বীরভূম
নিবেদিতা নাগ মজুমদার, কল্যাণী, নদীয়া
নির্ঝর চট্টোপাধ্যায়, সাটুই, মুর্শিদাবাদ
নুরুল ইসলাম মিয়া, সারগাছি, মুর্শিদাবাদ

পলাশ ব্যানার্জী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
মুস্তাফিজ রহমান, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ
মোঃ আনিকুল ইসলাম, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ
মোজামমেল সেখ, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ
রাজকুমার শেখ, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ
রূপক চট্টোপাধ্যায়, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ
শ্যামল বন্দোপাধ্যায়, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
শ্রীজাতা কংসবণিক, বর্ধমান
সাজ্জাদ আলম, পাভুয়া, হুগলি
সামিম আখতার খান, আমতলা, মুর্শিদাবাদ
সিদ্ধার্থ সিংহ, কলকাতা
সুকুমার রুজ, কলকাতা
সুকুমার সরকার, দক্ষিণ দিনাজপুর
সুপ্রীতি বর্মন, বর্ধমান
সুস্মেলী দত্ত, কলকাতা
সোহেল রানা, বাংলাদেশ
সৌরভ হোসেন, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ
হামিদা কাজী, বর্ধমান
হাবিবা খাতুন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

দীননাথ মণ্ডল-এর লেখা পুস্তক ও সম্পাদিত পত্রিকা
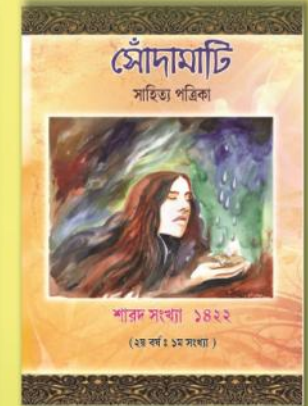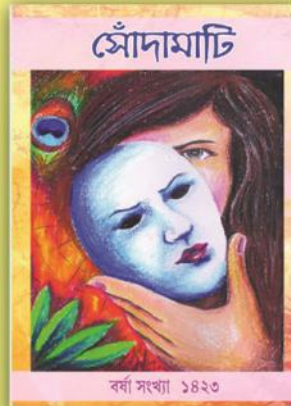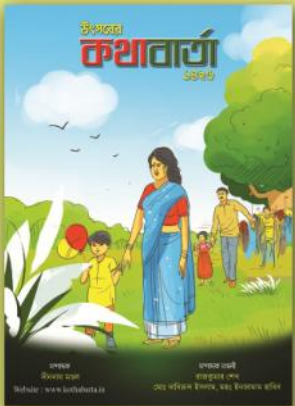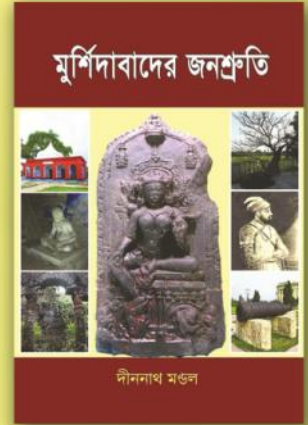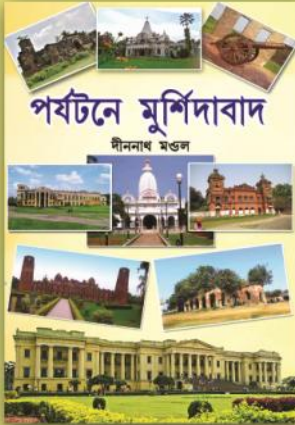
যোগাযোগ : M- 9153126613
website : www.dinanathmondal.blogspot.in
facebook : www.fb.com/shridinanathmondal